থমকে কেন দাঁড়িয়ে

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

অনিমা স্বর্ণকার কে

আন্তরিকতার সঙ্গে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাঁড়িয়ে

থমকে কেন দাড়িয়ে

ফার্মে চাকরি করতেন। মালিকদের সঙ্গে ওখানে মেজাজ রেখে চলতে পারলেন না। ভাগ্যক্রমে ওই সময় এই চাকরিটা জুটে গেল। তারপর থেকে বছর আড়াই এখানেই আছেন।

বিনীত ভঙ্গিতে ভৌমিক এসে দাঁড়ালেন।

বসুন।

ভৌমিক বসলেন।

রণবীর আবার বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, কানোবিয়াদের কাছ থেকে আর কোন মেসেজ এসেছে নাকি?

মিনিট দশেক আগে ওদের লোক এসেছিল স্যার। তাড়া দিয়ে গেছে আজই। আমি সোমবার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিন্তু–

পেমেন্ট আজই চায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি হারদয়াল কানোবিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে-ছিলাম। লাইন পাওয়া গেল না। লাইন পেলে ওকে ক'দিন সবুর করতে বলতাম। যাক, ও নিয়ে আর আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। টাকাটা আজই দিয়ে দেওয়া যাক।

এ তো খুবই ভাল কথা স্যার। ওদের সঙ্গে ভবিষ্যতেও যখন কারবার করতে হবে, তখন

সে তো বটেই। আপনি লেজার থেকে ওদের হিসাবটা একবার দেখে আসুন। আমি কারেক্ট ফিগারটা জানতে চাই আর কি!

মুখে হাসি টেনে ভৌমিক বললেন, লেজার দেখার দরকার নেই। আমার এগজ্যাকট ফিগারটা মনে আছে স্যার।

কত?

পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ' একান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

হুঁ। বীরেশ্বর এলেই টাকার ব্যবস্থা করছি। আপনি মুখার্জিকে গিয়ে বলুন মিনিট পনেরো পরে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

আমি এখনই গিয়ে বলছি স্যার।

হৃদয় ভৌমিক বেরিয়ে গেলেন।

শেষবারের মত টান দিয়ে অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে রণবীর আড়মোড়া ভাঙলেন। কানোরিয়া সিণ্ডিকেটের বাজে একটা অভ্যাসের কথা তাঁর নতুন করে মনে পড়ল। নিজেদের উৎপাদনে কুলিয়ে ওঠে না বলেই, প্রয়োজনের খাতিরে ওদের কাছ থেকে মাল নিতে হয়। সময় সময় আবার দাম কয়েক লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। সে তুলনায় এবারের ট্রাঞ্জাকসন অনেক কম। তবে ওদের একটা বদ অভ্যাস আছে, চেকে পেমেণ্ট নেবে না। সব সময় ক্যাশ। মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে ওদের পাঠানো যে সময় সময় অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, সে কথা পার্টিকে বোঝান যায় না। এই ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য ওরা কেন যে এত জোর দেয়, ভগবানই জানেন।

কর্তার ঘর থেকে বেরিয়ে হৃদয় ভৌমিক অরিন্দমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অরিন্দম কোম্পানির ম্যানেজার বিশেষ। প্রচুর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওকে কাজ করতে হয়। মাইনে-পত্র ভালই পায়। চক্রবেড়িয়া রোডে দু'খানা ঘর নিয়ে সে একাই থাকে। অবশ্য নিজের বলতে এক পিসি ছাড়া আর কেউ নেইও। তিনি বর্ধমানে -দেশের বাড়িতে থাকেন।

প্লাইউডের পার্টিশন দেওয়া ছোট্ট ঘর।

ঘরের ভেতরকার পরিবেশ অত্যন্ত ছিমছাম। অরিন্দম ঘরে একা নেই। ওর সামনের চেয়ারে বসে সুপ্রিয়া একটা পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সুপ্রিয়া সোম এই অফিসেরই ফাইলিং ক্লার্ক। চক্রবেড়িয়াতেই থাকে। আসল কথাটা হল, সুপ্রিয়ার দাদা গৌতম অরিন্দমের বন্ধু।

কথায় কথায় একদিন গৌতম বলেছিল, একটা উপকার করবে?

হাসি মুখে উত্তর দিয়েছিল অরিন্দম, সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।

আজ পর্যন্ত তো তুমি আমার বাড়ি গেলে না। সকলের সঙ্গে আলাপও হল না। তবে জানো নিশ্চয়, আমার একটি বোন আছে:

কেন জানব না? তুমি তো তাঁর কথা হাজার বার বলেছ। তোমরা তো দুই ভাই-বোন, তাই নয়?

তাই। বছরখানেক ধরে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে সুপ্রিয়া। চুপচাপ বসে থাকতে নাকি ওর আর ভাল লাগছে না। আমাকে ধরেছে একটা চাকরি খুঁজে দিতে। আমি যে কত তালেবর, তুমি তো জানো?

অরিন্দম আবার হাসল।

অর্থাৎ তোমার হয়ে ওকে আমায় একটা চাকরি দেখে দিতে হবে, এই তো?

ধরেচ ঠিক।

ভাল কোন চাকরির সন্ধান আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে

তবে?

আমাদের অফিসে একজন ফাইলিং ক্লার্ক নেওয়া হবে। মাইনে শ' আড়াইয়েকের মত। চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়ে যেতে পারে.

মন্দ কি! এখন এই চলুক। পরে বেটার কিছু যদি পাওয়া যায়, তবে--তুমি ভাই উঠে পড়ে লেগে ব্যবস্থাটা করে দাও।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা হল সুপ্রিয়ার।

এই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

প্রথম দর্শনেই সুপ্রিয়ার প্রেমে পড়ে গেল অরিন্দম। আক্ষেপে মন ভরে উঠেছিল। গৌতমের সঙ্গে আলাপ তো বেশ কয়েক বছরের।

অথচ এত দিনের মধ্যে ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে নি। গেলে সুপ্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় অনেক আগেই হয়ে যেত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে এই যথেষ্ট।

সুপ্রিয়া যে অত্যন্ত রূপসী তা নয়। তবে এমন একটা আলগা শ্রী আছে যে প্রত্যেকের চোখেই তাকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। অরিন্দম চালাক ছেলে। মন যাই বলুক, মুখে প্রথমে সে কিছু প্রকাশ করে নি। স্বাভাবিক নিয়মে একটু একটু করে এগিয়েছে। ওপক্ষেব কৃতজ্ঞতা বোধ যথারীতি অনুরাগে রূপান্তবিত হয়েছে ক্রমে। এই ব্যাপারটা অফিসের সকলেই মোটামুটি আঁচ করে।

ভৌমিক গলা খাঁকারি দিলেন।

অরিন্দম চোখ তুলল।

কিছুই যেন নয়, এমন একটা ভাব নিয়ে সুপ্রিয়া বসে বইল।

এই যে ক্যাশিয়ার বাবু! কিছু বলবেন?

অর্থপূর্ণ হাসিতে মুখ ভাসিয়ে দিলেন হৃদয় ভৌমিক।

বলব বৈকি। আমি হলাম কাজেব মানুষ। অকারণে তো আসি নি। তবে তাব আগে অন্য একটা কথা বলে নিই।

বলুন?

আপনাকে দেখলে হিংসা হয়।

তার মানে?

মানেটা যে বুঝতে পারেন নি, তা নয়। অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপারে একটু ভান টান থাকা ভাল।

ভ্রূ কুঁচকে অরিন্দম বলল, হেঁয়ালী আমাব তেমন আসে না। যা বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন!

এই দেখুন, আপনি সীরিয়াস হয়ে পড়লেন। হিংসে হয় বলছিলাম না। অফিসে তো আমরা কত লোকই আছি, অথচ মিস সোমের আপনার প্রতি—

ভৌমিক বাবু!!!

মিথ্যে চোখ রাঙাচ্ছেন মশাই। উচিত কথা বলতে আমি কখনো পেছপা হই না।

উচিত কথা সব সময় সব জায়গায় বলাটা যে স্বাস্থ্যকর নয়, এটা বোঝার বয়স আপনার হয়েছে। মিস সোম এখানে কাজে এসেছেন।

ওঁর কাজ তো জানি ফাইল নিয়ে। এখানে—

অরিন্দমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

আপনি আমার ধৈর্যপরীক্ষা নিচ্ছেন? ভবিষ্যতে একটা কথা মনে রাখলে ভাল করবেন। আমি এ অফিসের ক্যাশিয়ার নই, ম্যানেজার। পদমর্যাদায় ম্যানেজাররা সব সময় ক্যাশিয়ারদের ওপরে থাকে। যা হোক, কি যেন বলতে এসেছিলেন? অসুবিধা না হলে, দয়া করে এবার সে কথাটা বলে ফেলুন।

রাগে ভৌমিকের মুখ থমথম করতে লাগল। প্রতিবাদ করার সাহস অবশ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না। আর বাড়াবাড়ি করলে সমস্ত কিছু মালিকদের কানে উঠতে পারে। আসল কথাটা হল এখনও পর্যন্ত কোন মেয়ে ভৌমিকের প্রেমে পড়ে নি। বহুবার বহুক্ষেত্রে নানা ধরনের ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু সবই বিফল হয়েছে।

তারপরই তিনি সুপ্রিয়াকে দেখলেন। তাঁর অফিসে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনে ভৌমিকের চিত্তে যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিল, তার বেগ সামুদ্রিক ঝড়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আশায় বুক বাঁধার মুখেই কিন্তু তিনি বাধা পেলেন. প্রচুর বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, তাঁদের দু'জনের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত বিরাজ করছে অফিসের সুদর্শন ম্যানেজার অরিন্দম মুখার্জি।

অনিচ্ছার সঙ্গেই ভৌমিক বললেন, মিনিট পনেরো পরে সেন সাহেব আপনাকে তাঁর ঘরে যেতে বলেছেন।

কথা শেষ করেই তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অরিন্দম হাসল।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল সুপ্রিয়া। এবার বলল, লোকটা ভারি অসভ্য।

ভাল জিনিসের ওপর লোভ সকলেরই হয়।

সেই ভাল জিনিস যদি চিরকালের মত পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবু হ্যাংলামো করতে হবে ?

এও এক ধরনের বিকার। আচ্ছা, এরকম উমেদার তোমার আরো কতজন আছে ?

মৃদু হেসে সুপ্রিয়া বলল, ডজন খানেক। জোর দিয়ে কিন্তু কিছু বলছি না। আরো বেশিও থাকতে পারে।

তোমার উমেদারের সংখ্যা এইভাবে হুহু করে বাড়তে থাকুক, আমি আর তা চাইছি না। সামনের মাস থেকে তুমি আর অফিসে আসবে না।

ওমা, সেকি ! অফিসে না এসে আমি কি করব ?

আমার ফ্ল্যাট আলো করবে।

আমি এবার পালাই। এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে। এরপর তুমি যদি আবার বিয়ের ফর্দ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ কর

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল।

বস—বস। কথা আছে।

না মশাই, আর কথা নয়। এটা অফিস।

সুপ্রিয়া আঁচল দুলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অরিন্দমের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। গৌতমের সঙ্গে কথাবার্তা আজকালের মধ্যেই সেরে নিতে হবে। ব্যাপারটাকে আর ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিল। কর্তার ঘরে আরো মিনিট কয়েক পরে গেলেও চলবে। ইতি-মধ্যে একবার নেশা করে নেওয়া যেতে পারে।

অরিন্দম সিগারেট ধরাল।

ওদিকে—

বীরেশ্বর বিশ্বাস কিছুটা ব্যস্তভাবেই রণবীরের ঘরে প্রবেশ করলেন। চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটির এই বয়স পঁয়তাল্লিশের সামান্য কিছু নিচেই হবে। একটা বেপরোয়া ভাব তাঁর সারা শরীরে যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। নদীয়ার কোন বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। বর্তমানে রিজেন্ট পার্কে থাকেন।

বেয়ারার মুখে শুনলাম, তুমি নাকি আমার খোঁজ করছিলে?

বসতে বসতে বীরেশ্বর বললেন।

বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসে মৃদু টান দিয়ে নিয়ে রণবীর বললেন, দেরিতে অফিস আসার অভ্যাসটা তুমি ছাড়তে পার না?

বোধ হয় না।

কেন?

পুরোন অভ্যাস কি এত তাড়াতাড়ি ছাড়া যায়? এবার কাজের কথায় এস। কেন খুঁজছিলে তাই বল এবার।

বিরক্তি চেপে রণবীর বললেন, কথা তো অনেক আছে। সে সমস্ত পরে হবে। এখন কানোরিয়াদের পেমেণ্টের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

এই এক ঝামেলা। ক্যাশ টাকা ছাড়া ব্যাটারা পেমেণ্ট নেবে না। এ নিয়ে ওদের সঙ্গে সীরিয়াসলি কথাবার্তা বলতে হবে। চেকটা রেডি করেছ নাকি?

তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

রণবীর দেরাজ থেকে চেকবই বার করলেন।

চেকটা পামেলার নামে দিচ্ছি। ও ক্যাশ করিয়ে নিয়ে আসুক। সঙ্গে মুখার্জি থাকবে।

ঠিক আছে।

অরিন্দম ঘরে প্রবেশ করল।

দুই কর্তাকে একসঙ্গে আশা করে নি।

আমায় ডেকেছেন স্যার?

হ্যাঁ।

রণবীর বললেন, কাজের খুব চাপ নেই বোধ হয়?

তেমন কিছু নয়।

বীরেশ্বর বললেন এবার, পামেলা দত্তর সঙ্গে আপনাকে একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে একজন দরোয়ানকেও সঙ্গে নিতে পারেন। মোটা টাকার ব্যাপার।

দিনকাল আজকাল খুব খারাপ। সাবধানে থাকবেন। গাড়ির চাবিটা নিন।

নিজের গাড়ির চাবি এগিয়ে ধরলেন রণবীর।

অরিন্দম চাবি নিল।

এই সিস্টেমটা একেবারেই ভাল নয় স্যার। আমার যতদূর মনে হচ্ছে কানোরিয়াদের টাকার ব্যাপারেই বোধ হয় ব্যাঙ্কে যেতে হচ্ছে। সকলের মত ওরাও যাতে চেকে পেমেন্ট নেয়, তার জন্য চাপ দেওয়া দরকার।

বীরেশ্বর বললেন, খাঁটি কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে। আজই ওদের সঙ্গে কথা বলব। সেন—

বল?

তুমি ব্যাঙ্কে ফোন করে জানিয়ে দাও, অ্যামাউন্ট আর কার নামে চেক দেওয়া হচ্ছে। আমি এখন নিজের ঘরে যাচ্ছি।

রণবীর বললেন, চেকটা সই করে দিয়ে যাও।

তাই তো।

বীরেশ্বর চেকে সই করলেন। রণবীরও।

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট।

টাকাটা এলে আমায় খবর দিও। —বীরেশ্বর বললেন, ক্যাশিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাব ওদের কাছে।

কথা শেষ করেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রণবীর ফিরলেন অরিন্দমের দিকে।

আপনি মিস দত্তকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন। ইতিমধ্যে ফোনে ব্যাঙ্কে জানিয়ে রাখছি।

মিস দত্ত অর্থাৎ পামেলা দত্ত —সেন এবং বিশ্বাসের সেক্রেটারি। কথাটা নিশ্চিত ভাবে অদ্ভুত শোনাচ্ছে। দু'জন বস্-এর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি হয় না। এখানে কিন্তু সেই বে-নিয়ম ব্যাপারটাই পাকাপোক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর কারণ অবশ্য একটা আছে। কাজের চাপ তেমন না থাকায়, একজন সেক্রেটারিকে দিয়েই যখন কাজ চলে যাচ্ছে, তখন দুজনের জন্য দুজনকে রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি কর্তারা।

পামেলা দত্ত কিন্তু খাঁটি বাঙালী নয়। রক্তে একটু হেরফের আছে। ওর বাবা সুবিনয় দত্ত আর্মির লোক ছিলেন। পাকে-চক্রে তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল নার্স ডরোথি মিলারকে। পামেলার যখন মাত্র তেরো বছর বয়স, তখন সুবিনয় দত্ত ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সুরার প্রতি একটু বেশি মাত্রায় নেক-নজর থাকার দরুন টাকা পয়সা রেখে যেতে পারেন নি।

ডরোথি কলকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ার মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর সে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠল এলিয়ট রোডের এক নোনা-ধরা ঘরে। এর পরের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বলার কোন প্রয়োজন নেই। এইটুকু জেনে নিলেই যথেষ্ট হবে যে, পামেলার বয়স যখন একুশ, তখন দুনিয়ায় সে সম্পূর্ণ একা। ঘৃণ্য রোগে জরাজীর্ণ ডরোথি মাত্র কিছুদিন আগে মারা গেছে। এ অবস্থায় পড়লে অন্য যে কেউ চোখে অন্ধকার দেখত। পামেলা শক্ত ধাতের মেয়ে। সামান্য ঘাবড়ালেও সে একটা চাকরির সন্ধানে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়ল।

চেহারায় জৌলুষ আছে। মায়ের পথ অবলম্বন করলে কাঁচা পয়সা হাতে আসতে দেরি হত না। ও-পথ সে পরিহার করল—অনেক প্রলোভনকে জয় করতে হল মনকে দৃঢ় করে। শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপিং

জানা ছিল। ওই জ্ঞানকে মূলধন করে অফিস পাড়ার দরজায় দরজায় ঘুরতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত চাকরি পেয়ে গেল এই অফিসে।

অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখেই ওকে পাশ কাটিয়ে প্রবেশ করল রোগা আর লম্বা ধরনের একজন লোক। সোমেন গুহ। বৈশিষ্ট্য-হীন চেহারা দেখলে বোঝার উপায় নেই, মধ্য-যৌবনেই সে অভ্রের বাজারের একজন নাম-করা দালাল হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে সোমেনের ঘন ঘন যাতায়াত আছে।

বস, গুহ। আমি একটা ফোন সেরে নিই।

রণবীর ক্রেডেল থেকে রিসিভার তুলে নিলেন। ব্যাঙ্কের এজেন্টের সঙ্গে কথা বললেন কয়েক মিনিট। কত টাকা তোলা হবে এবং কার নামে চেক দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ধরনের কথা বলে নিলেন। মোটা টাকা তোলার আগে প্রতিবারই এই ধরনের সতর্কতা এঁরা নিয়ে থাকেন। রিসিভার নামিয়ে রেখে গুহর দিকে তাকিয়ে হাসলেন সেন।

কিছু লাভের কথা শোনাতে এসেছ মনে হচ্ছে?

পানের রসে চর্চিত দাঁত বার করে হাসল সোমেন গুহ।

আমার মারফৎ ভাল তো আপনারা কিছু কম করলেন না স্যার। মাঝ থেকে আমি--

ও কথা বোলো না। আমাদের মত এত কমিশন তোমাকে আর কেউ দিত না।

কি যে বলেন স্যার। টাকার থলি নিয়ে অনেকেই বসে আছে। নেহাৎ আপনাদের প্রতি আমার ভালবাসা একটু বেশি বলে -

তুমি অন্য কারোর কাছে যাও না, এই তো? এবার ঝেড়ে কাশো তো। এই সমস্ত ভূমিকা কিসের, তা নিশ্চয় জানা দরকার।

দরকার বৈকি। এবার এক দারুণ কাজের সন্ধান এনেছি। তবে ওই যে বললাম. আপনি তো বুঝতেই পারছেন, কমিশন একটু না বাড়ালে…মানে…

বড় ধরনের কাজ যদি হয়, কমিশন বাড়বে।

রণবীর আবার বললেন, আমাদের বিবেচনায় কাজ যদি সত্যি বড় ধরনের হয়, বীরেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে নিশ্চয় তোমার কমিশন দেওয়া হবে। এবার আর ভণিতা না করে কাজের কথাটা পেড়ে ফেল।

গুহ মুখ খোলার আগেই সুইংডোর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল পামেলা। ওকে দেখলে যে কোন পুরুষের মনে বোধ হয় এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা জাগতে পারে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহের প্রতিটি খাঁজ ছন্দময়। মুখের আদলে কিছুটা বাঙালীআনার অভাব থাকলেও লাবণ্যময়ী। বব-করা চুলের প্রান্তগুলি সুন্দরভাবে পাক খেয়ে খেয়ে রয়েছে। পরনে লাল আর নীলে মেশামেশি ট্রাইলেক্স শাড়ি। এখন হাতে রয়েছে পেন্সিল আর নোট নেবার খাতা।

রণবীর বললেন, এখন ডিক্টেশন দেবার জন্য আপনাকে ডাকি নি মিস দত্ত। অন্য একটা কাজ ছিল।

ব্যাঙ্কে যেতে হবে বোধ হয়? মিস্টার মুখার্জি যেন ওই রকমই বললেন।

কথাবার্তা বাংলাতেই হল। এতে কিছুটা বিস্ময় বোধ থাকতে পারে। পামেলার বাবা বাঙালী ছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গ ও বেশি পায় নি। দীর্ঘদিন কেটেছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মা'র আওতায় এবং অবাঙালী পরিবেশে। তবুও পামেলা পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে—বলা বাহুল্য অনেক আয়াসেই এই ভাষা আয়ত্ত করেছে।

ঠিকই শুনেছেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। আপনার চেক রেডি। আগেও তো কয়েকবার ভাঙিয়ে এনেছেন?

হ্যাঁ, স্যার। আমার সঙ্গে কে যাচ্ছেন?

রণবীর চেকটা এগিয়ে ধরে বললেন, মিস্টার মুখার্জি আপনার সঙ্গে থাকবেন। দু'জন দরোয়ানও যাবে। আর দেরি করে লাভ নেই। মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ুন, লাঞ্চের আগে ফিরে আসতে পারবেন।

চেকটা এক-নজর দেখে ভাঁজ করল পামেলা।

এতক্ষণ সোমেন গুহ পামেলাকে যেন লেহন করছিল।

এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, জব্বর ব্যাপার মনে হচ্ছে। চেকের ফিগারটা আমি জানতে পারি, স্যার ?

না। তুমি তা পার না।

মুখ ফেরালেন উনি।

মিস দত্ত, আপনি এবার--

কথাটা শেষ করতে পারলেন না রণবীর। মুখ নড়ল, কিন্তু কথা বেরোল না। নিজের দু-হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন। এক বিচিত্র ছটপটানি ওঁকে পেয়ে বসল। মিনিট খানেক প্রায় স্থায়ী হল এই ভাব, তারপরই ওঁর মুখ সজোরে নেমে এল টেবিলের দিকে। পুরু টেবিলে পাতা পুরু কাচের ওপর সশব্দে ঠুকে গেল কপাল।

ঘটনার গতি পামেলাকে অবাক করে দিল।

গুহর অবস্থাও তথৈবচ।

রণবীর নির্জীব অবস্থায় পড়ে আছেন। দ্রুত নিজেকে পামেলা সামলে নিল। গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে, এ সম্পর্কে গুহরও আর কোন সন্দেহ নেই। রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে নেতিয়ে পড়া দেহটার দিকে সে আবার তাকাল। বলল, ভদ্রলোক মারা গেলেন নাকি ?

বাজে কথা বলবেন না!--তীক্ষ্ণ গলায় পামেলা বলল, নিশ্চয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনই একজন—

কথা না শেষ করেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গুহ আঁৎকে উঠল : কি সর্বনাশ! এ ঘরে আমি একা!

ঘরের বাইরে তখন উত্তেজিত কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে। ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন বীরেশ্বর। তাঁর পিছু পিছু অরিন্দম, হৃদয় ভৌমিক এবং আরো অনেকে। হাইপ্রেসার রণবীরের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, একথা সকলেই জানে। যেমন হয়—করোনারি অ্যাটাক হল কি ?

বীরেশ্বর দ্রুত রণবীরের নাড়ী পরীক্ষা করলেন। তাঁর যা একটু আধটু নাড়ীর জ্ঞান, তাতে বুঝলেন মর্মান্তিক কিছু ঘটে নি। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও মারা যান নি রণবীর। ক্ষীণ গতিতে নাড়ী চলছে। বীরেশ্বর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মুখার্জি—

অরিন্দম পাশেই ছিল: বলুন স্যার?

কাছাকাছি ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা দেখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনে উপস্থিত করা চাই।

টেলিফোন অপারেটার বিনয় রক্ষিত বলল, লালবাজার স্ট্রীটে একজন ডাক্তার বসেন। তাঁকে এখন পাওয়া যেতে পারে।

অবিন্দম ছুটল।

সকলে এবার ধরাধরি কবে রণবীরকে ওপাশে রাখা গড়ানো চেয়ারটায় আধশোয়া অবস্থায় বসিয়ে দিল। মনে হল, মূর্ছার মত ভাবটা কেটে আসছে। বারদুয়েক যন্ত্রণাসূচক শব্দ করলেন উনি। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে তাকালেন। মনে হল চোখের দৃষ্টি পবিস্কাব নয়, পাতা দুটিও পুবোপুবি খুলল না।

বীরেশ্বব ঝুঁকে পড়লো পার্টনাবের দিকে: খুব কষ্ট হচ্ছে, সেন?

সেন ক্ষীণ গলায় বললেন, এখন একটু ভাল।

প্রেসারের জন্য কি—

না। পুরোন কলিকটা আবার চাগাড় দিয়েছে বিশ্বাস।

আর কথা বোলো না। চুপচাপ এইভাবে কিছুক্ষণ থাকো। খবব পাঠিয়েছি। ডাক্তার এখনই এসে পড়বেন।

রণবীর বললেন, আমি বাড়ি ফিরতে চাই। এখানকার বদ্ধ হাওয়া আমাকে আরো অসুস্থ করে তুলবে।

কিন্তু এ অবস্থায়—

আমি ঠিক যেতে পারব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে।

বললাম না ডাক্তার আসছেন?

এবার কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে রণবীর বললেন, ও সমস্ত আজে-বাজে ডাক্তারের ওপর আমি ভরসা করতে পারি না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে খবর দেব। উনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

বীরেশ্বর বুঝলেন, ডাক্তারের অপেক্ষায় আর থাকা চলবে না। রণবীরকে বাড়ি পৌছে দেওয়াই শ্রেয়। অসুস্থতার দরুণ তিনি অধৈর্যপনার শিকার হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া নিজের ফিজিসিয়ান ছাড়া আব কারোর ওপর আস্থাও বাখতে পাবছে না। সুতবাং তাঁব কথা মর্ত এখন কাজ করাই হল যুক্তিযুক্ত।

অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় রণবীরকে নিজের গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললেন বীরেশ্বর। অফিস সংক্রান্ত কিছু কথা ক্যাশিয়ারকে বলে উনি রওনা হয়ে পড়লেন। বেয়ারা এবার বণবীরেব অফিস ঘরে ঢুকল। সমস্ত কিছু ঠিক ঠাক করে সাহেবের ঘরে সে তালা লাগিয়ে দেবে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে অবাক হল।

পামেলা মেমসাহেব অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মেমসাহেব—

অ্যাঁ—ও, ! ঘর বন্ধ করবে বুঝি ?

উত্তবেব অপেক্ষা না করেই পামেলা ওখান থেকে বেবিয়ে এল। নিজেব সিটের কাছে না গিয়ে কিছুটা দ্রুতপায়েই চলে গেল টয়লেটে। বলা বাহুল্য, অফিসের কাজকর্মে এখন জমজমাট ভাব নেই। সেন সাহেবেব শরীর খারাপ নিয়ে আলোচনা চলছে এখানে।

পামেলা টয়লেটের দবজা ভেজিয়ে দিল। তাকাল বেসিনেব কিছুটা ওপরে লাগান আয়নার দিকে। তার সুন্দর মুখের ওপর চিন্তাব ছায়া পড়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে—চিবুকে। ঘাম মুছে ফেলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে সে মুখ ফিরিয়ে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিল। এটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বাথরুম। সুপ্রিয়া ছাড়া আর কারোর আসবার সম্ভাবনা নেই।

তবু পামেলা কিছুটা পিছিয়ে এসে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। দরজা ভেজান দেখেও যদি সুপ্রিয়া ঠেলে ঢুকে পড়ে। বলা তো কিছু যায় না। ছো.ট ব্যাগটা রেখেছিল বেসিনের ওপরে। তার থেকে এবার বার করল চেকটা। গোলমালের দরুণ চেকের কথা আর কারোর মনে পড়ে নি। অবশ্য বীরেশ্বর বা অফিসের আর কাবোর জানা নেই রণবীর চেকটা তাকে দিয়ে দিয়েছেন।

পঁয়ষট্টি হাজার!

লোভে দু'চোখ চকচক করে উঠল পামেলার। এই একটা মাত্র জিনিসের ওপব পামেলার দুর্নিবার আকর্ষণ। সে রূপ আর যৌবনকে নিজেব জননীর মত সস্তায় যেখানে সেখানে বিক্রি কবে নি এটা ঠিক। তবে এই বকম একটা সুযোগ করায়ত্ত করার জন্য সে নিজেকে বেহায়াব মত বিলিয়ে দিতে পশ্চাদপদ হবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত সুযোগের সিংহদ্বার তার সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। ভাগ্যক্রমে এমন দিনে আর এমন পরিবেশে এই সুযোগ এসেছে যে, জানাজানি হবার বহু আগেই সে পরিচিত গণ্ডীর বাইবে চলে যেতে পারবে। আগামী কাল গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছুটি, পরশু রবিবাব হৈ-হৈ বাধবে সোমবার দিন।

পুলিশ আসবে। আসুক। পামেলা তখন অনেক দূরে।

চেক আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে জানানো আছে, কাজেই ওখানেও কোন সন্দেহ দেখা দেবে না। এবার রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলল। আয়নার দিকে আবার তাকিয়ে নিয়ে নিজেকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করল। বড় কাজে নামবার আগে নেতিয়ে পড়া ভাবের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

পামেলা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

অফিস আবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কাজে মন দিয়েছে সকলে।

এখন একটা অজুহাত দেখিয়ে অফিস থেকে বেরোতে হবে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যাঙ্ক বন্ধ হতে অবশ্য বেশ দেরি আছে, তবু—। পামেলা নিজের সিটে গিয়ে বসল। তুলে নিল একটা বই। হাতে কাজ না থাকলে বই পড়াই তার অভ্যাস। সমস্ত কিছু এমন ভাবে করতে হবে, যাতে অস্বাভাবিক মনে না হয়।

পাঁচ মিনিটও বোধ হয় কাটে নি।

মিস দত্ত—

পামেলা মুখ তুলল।

অরিন্দম এসে দাঁড়িয়েছে।

মিস্টার সেন তো বাড়ি চলে গেলেন। এই ভাল হল। ওঁর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ওঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল।

বটেই তো। এদিকে আমিও লালবাজারের ডাক্তারে দেখা পাই নি। মিস্টার বিশ্বাস ওঁকে বাড়ি নিয়ে গেছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমাদেরও আজ ব্যাঙ্কে যেতে হল না।

পামেলা ফিকে হাসল: তাই তো দেখছি।

অরিন্দম ওর কাছ থেকে সরে এসে হৃদয় ভৌমিকের সামনে দাঁড়াল।

ভৌমিকবাবু—

তীক্ষ্ণ গলায় ভৌমিক বললেন, বলুন!

কানোরিয়াদের ফোন করে জানিয়ে দিন, কেন আজ আমরা টাকা পাঠাতে পারছি না। সোমবার দিন নিশ্চয় টাকা যাবে। বেশ গুছিয়ে বলবেন।

আমি কথা গুছিয়েই বলি।

পামেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এক ঝলক তাকিয়ে নিল নিজের রিস্টওয়াচের দিকে, বারোটা দশ। এবার অফিস থেকে বেরোন দরকার। ঠিক ছুটোর সময় ব্যাঙ্কের লেনদেন আবার বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড দুঃসাহস এখন পামেলাকে পেয়ে বসেছে। এই দুঃসাহসের উৎস

কোথায় বুঝে উঠতে পারছে না। না বোঝা গেলেও ক্ষতি নেই। মূল কথা হল, টাকাটা চাই। সম্পূর্ণ নিজের করে চাই।

লাঞ্চের সময় আসতে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এই সময় অফিস থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেলে অনেকেই অবাক হবে। প্রশ্ন জাগবে কোথায় গেল। এর থেকে কোন একটা অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার চেয়ে কোন একটা অজুহাত খাড়া করে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

একটু চিন্তা করে নিল পামেলা।

অফিসে টেলিফোন অপারেটর আছে। তার কাছে নম্বর নিয়ে লাইন চাইলে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। এছাড়া একটা ডাইরেক্ট লাইনও আছে। বিশেষ প্রয়োজনে ডাইরেক্টররা এই লাইনে কথা বলে থাকেন। ওই ফোনটা আছে বীরেশ্বর বিশ্বাসের ঘরে। পামেলা ওঁর ঘরের দিকে এগোল।

থামল ঠিক ঘরের সামনে। দরজায় তখনও তালা পড়ে নি। নিয়মমত বেয়ারা বসে আছে টুলে। সে নিশ্চয় জানে না, তার সাহেব আজ আর ফিরবেন না। ও না জানুক, পামেলা জানে বিশ্বাস সাহেব আজ ফিরবেন না। রণবীরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার সময় ও-কথাই তিনি বলে গেছেন তাকে।

বেয়ারা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল : কিছু বলবেন মেমসাহেব ?

আমি তো ভেবেছিলাম, ঘরে তালা লাগিয়ে তুমি সরে পড়েছো।

বেয়ারা ত্রস্ত গলায় বলল, এ কি বলছেন মেমসাহেব ! আমি যাব কোথায় ? সাহেব এখনই এসে পড়তে পারেন।

আমার নোটের খাতাটা—

কথা শেষ না করেই পামেলা ঘরে ঢুকল।

অর্থাৎ নোটের খাতাটা সে এই ঘরে ফেলে গেছে, এখন এসেছে নিয়ে যেতে। টেবিলের কাছে পৌঁছেই রিসিভার তুলে নিল। তার কথা যাতে অফিসের অপারেটরের কানে না যায়, তাই এই লাইন

থেকে কথা বলা দরকার। দ্রুত হাতে ডায়েল করতে লাগল পামেলা।

হ্যালো—

ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

বেঞ্জামিন ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।

মিনিট দুয়েক পরেই ওপাশ থেকে অন্য একজনের গলা ভেসে এল : ঘোষ কথা বলছি।

আমি পামেলা।

হ্যালো ডিয়ার—বিশ্বাস কর, মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। একেই বলে অন্তরের টান—ঠিক এই সময় তুমি—

বেঞ্জ, আবেগ এখন থাক। একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শোন—

বল—

আমি লাইন ছেড়ে দেবার পরই তুমি আমাদেব ম্যানেজারকে ফোন করবে। নম্বর জানো তো ?

জানি, কিন্তু ব্যাপারটা কি—

দেখা হলে বলব। ফোন করাটা ভীষণ জরুরি।

বেশ, ফোন করব। কি বলতে হবে তাঁকে ?

তাঁকে বলবে আমার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন —

বেঞ্জামিনের গলায় বিস্ময়ের স্বর, তোমার মা·· বলছ কি ! তিনি তো বহুদিন হ'ল কবর নিয়েছেন—

ওকথা এখন ভুলে যাও। যা বললাম, তাই বলবে। গলার আওয়াজে উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলতে ভুলবে না। মাব কথা বলার পর লাইনে আমাকে চাইবে।

এতক্ষণে বুঝলাম, অফিস থেকে বেরোবার তাড়া আছে। ঠিক আছে, অজুহাত আমি ভাল, ভালই খাড়া করতে পারব।
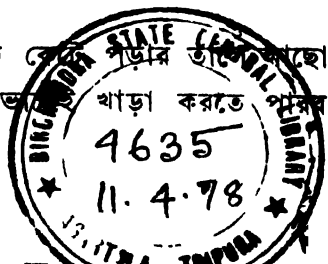
এবার বল ডিয়ার, ওখান থেকে সরে পড়ে আমার কাছে আসছ কিনা!

তুমি একটা আস্ত হাঁদারাম! তোড়জোড় তো ওই জন্যেই। অফিস একেবারে ভাল লাগছে না। আমি এবার ছাড়ছি, ফোনটা এখনই করো।

আমাকেও তাহলে অফিস থেকে কাটতে হচ্ছে। তোমার জন্য অপেক্ষা করব কোথায়?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে।

পামেলা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ঘরের বাইরে আসতেই—

খাতাটা পেলেন মেমসাহেব?—বেয়ারার সবিনয় প্রশ্ন।

না। অন্য জায়গায় খুঁজে দেখি।

পামেলা নিজের জায়গায় এসে বসল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল আবার। বারোটা কুড়ি। সময়ের দোষ নেই। নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে। মনের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা নিয়েই পামেলা বইখানা তুলে নিল। একটা লাইনও পড়তে ইচ্ছে করছে না। তবু সমস্ত কিছু যাতে স্বাভাবিক মনে হয় এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার।

মিনিট পাঁচেক কেটেছে বোধ হয়। বেয়ারা এসে জানাল, ম্যানেজার সাহেব ডাকছেন।

পামেলার শরীর একবার কেঁপে উঠল। নিশ্চয় বেঞ্জ ফোন করেছে। তাই যেন হয়। যীশুকে স্মরণ করে নিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে সে অরিন্দমের ঘরে ঢুকল।

অরিন্দম বলল, ফোন এসেছে। আপনার মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

পামেলা আকাশ থেকে পড়ল।

সেকি! তাঁকে তো অফিসে আসবার আগে অত্যন্ত ভাল দেখে এসেছি। কে ফোন করছিল, নাম বলেছে?

বেঞ্জামিন ঘোষ। লাইনে আছেন ভদ্রলোক। কথা বলুন।

টেবিলের ওপর রিসিভার শোয়ানো ছিল। পামেলা তুলে নিল : হ্যালো!

কি বলছেন! ওঁকে তো···

ভাগ্যিস আপনারা সময়মত গিয়ে পড়েছিলেন! ডাক্তারকে···

আচ্ছা, আমি আসবার চেষ্টা করছি। ছাড়লাম এখন—

রিসিভার ক্রেডেলের ওপর রেখে পামেলা ফিরে দাঁড়াল : মিস্টার মুখার্জি—

আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি মিস দত্ত। কিন্তু যতদূর জানতাম আপনি একলাই থাকেন। আপনার মা—

আপনি ঠিকই জানতেন। মা আসানসোলে থাকেন। দিন তিনেক হল এসেছেন এখানে। মিস্টার সেন বা মিস্টার বিশ্বাস অফিসে নেই। আপনি অনুমতি করলে—

নিশ্চয়। আজ আপনার কাজও তো কিছু নেই। বাড়ি চলে যান। অফিস থেকে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি নেবেন।

ধন্যবাদ।

পামেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিজের টুকিটাকি জিনিস ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যখন রাস্তায় এসে পা দিল, তখন বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ হল বড় ধরনের একটা ব্রীফকেস কেনা। এত নোট বয়ে নিয়ে যাবার মত একটা জায়গা তো চাই।

ভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ধর্মতলায় নিউ সিনেমার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল পামেলা। ওখানকার ফুটপাথেই অনেক কিছুর সঙ্গে সুটকেশ ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। দেখে-শুনে, দরদস্তুর করে কেনার সময় এখন নেই। যে

ব্রীফকেসটা চোখে লাগল, বিক্রেতা যা দাম চাইল, তাই দিয়ে ওখান থেকে সরে এল পামেলা।

মাত্র গজ দশেক দূরে ব্যাঙ্ক।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। না, চেনাজানা কেউ নেই। এবার রাস্তা পার হতে হবে। অপর ফুটপাথে ব্যাঙ্ক। শ্যামবাজারগামী একটা ট্রাম আর গোটাচারেক মোটরের বাধা সরে যেতেই দ্রুত পায়ে পামেলা রাস্তা অতিক্রম করল। ঘড়িতে এখন একটা বেজে ছ' মিনিট হয়েছে।

ওদিকে —

পৌনে একটার সময় বেঞ্জামিন অফিস থেকে বেরোল। একটু দেরি হয়ে গেছে। আরো একটু আগে বেরোলে ভাল হত, পামেলা আবার ভীষণ অধৈর্য স্বভাবের মেয়ে। দেরি হবার অবশ্য কারণও রয়েছে। উঁচু দরের দরের কথা, নিচু দরেরও কোন অফিসার বেঞ্জামিন নয়। প্রকৃত অর্থে সে টেলিফোন মিস্ত্রী। ওপরওয়ালাকে খোসামোদ করেই এই ধরনের ছুটি মাঝে মধ্যে নিতে হয়। কাজেই অফিস থেকে বেরুতে কিছু সময় লাগবেই।

বেঞ্জামিনকে দেখলে অবশ্য বুঝতে পারা যায় না, সে সামান্য মাইনের টেলিফোন মিস্ত্রী। ভগবান দত্ত চেহারাখানা সত্যি দেখবার মত। উচ্চতায় ছ' ফিট এক ইঞ্চি। মাংসর বাহুল্য শরীরে নেই। যেখানে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই আছে। হালকা তামাটে গায়ের রং। মুখে এমন একটা শ্রী আছে, যা সকলকেই আকর্ষণ করে। ক'জন মেয়ের মন সে হরণ করেছে, সঠিক ভাবে জানা না গেলেও, বন্ধুরা ঠাট্টা করে তার সম্পর্কে বলে, ভাগ্য করে এসেছে বটে— লেডি কিলার।

বেঞ্জামিনের জামাকাপড়ের বাহার দেখার মত। যা পরলে আরো সুন্দর, আরো স্মার্ট দেখায় সেই সমস্ত জামা কাপড়ই তার গায়ে সব সময় শোভা পাচ্ছে। ঘনিষ্ঠ পরিচিত যারা নয়, তারা ভাবে, মাইনে

তো পায় সামান্য, এত ঠাটবাট বজায় রাখে কিভাবে? নিশ্চয় বাঁকা পথে রোজগারের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

তা কিন্তু নেই।

আসল কথাটা হল, বেঞ্জামিনের বাবা ছিলেন মেল ট্রেনের ড্রাইভার। এবং অন্যান্যদের মত তিনি মদের পিপায় সাঁতার দেওয়া পছন্দ করতেন না। কাজেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত মোটা টাকাই জমিয়ে ছিলেন। বেঞ্জামিনের বয়স তখন সতেরো। এখন একত্রিশ।

বাবার মৃত্যুর এক বছর পরে আবার আরেকটা ঘটনা ঘটল। ওর মা চটুল মহিলা ছিলেন। বয়স একটু হলেও স্বভাবটা বজায় ছিল। অচিরেই তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন একজন মিশনারী স্কুলের শিক্ষক। তিনিও অবশ্য কচি খোকা ছিলেন না। বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের।

অল্প বয়সেই বেঞ্জামিন বেশ ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেল। ওই সঙ্গে সমস্ত টাকাটাই এসে গেল তার হাতে। অন্য কেউ হলে হয়তো অল্প-দিনের মধ্যেই সমস্ত উড়িয়ে দিত। স্বভাবের গুণে এক্ষেত্রে তা হল না। সুদের টাকাতেই তার মোটামুটি চলছিল। তারপর এই চাকরিটা পেয়ে গেল। সাড়ে তিনশ' টাকা মাইনে। চোখ ঝলসানো জামা-কাপড় পরতে আর বাধা কোথায়?

পামেলার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় হঠাৎই।

গত বছর বড়দিনের অবকাশে বল ড্যান্সের আয়োজন করেছিলেন হেনরী কার্টিজ। প্রতি বছর যে এরকম করেন, তা নয়। হরিয়ানা না কোথাকার লটারিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন কার্টিজ। সকলে ধরে বসল। নাচের আয়োজন না করে আর থাকতে পারলেন না। বেঞ্জামিনও আমন্ত্রণ পেয়েছিল। ওখানেই দু'জনে মুখোমুখি হল। মনে হয় প্রথম দর্শনেই উভয়কে ভাল লাগার মাত্রাটা চড়া ধরনের হয়েছিল। তাই অল্পদিনের মধ্যেই পরিচিতরা লক্ষ্য করলেন দু'জনকে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করতে।

বেঞ্জামিন আর অপেক্ষা না করে পামেলার অফিসের সামনে এসে উপস্থিত হল। আগেও কয়েকবার এসেছে। এসেছে লাঞ্চ হবার ঠিক পরে। গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে থেকেছে পামেলা। তারপর দুজনে গেছে 'মন্টিকার্লো'তে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে।

আজ কিন্তু সে দাঁড়িয়ে নেই।

দেখা হলে দরোয়ানের সঙ্গে।

পামেলা মেমসাহেব অফিসে আছেন?

দরোয়ান মন্থর গলায় বলল, না, সাহেব। কিছুক্ষণ হল বেরিয়েছেন।

কোথায় গেছেন তুমি জান?

তা তো জানি না। ট্যাক্সি করে কোথায় গেলেন।

বেঞ্জামিন বিলক্ষণ অবাক হল। এমন তো হবার কথা নয়। তাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে কোথায় কেটে পড়েছে। এটা কি ধরনের ভদ্রতা? অবাক ভাবটা ক্রমে বিরক্তিতে পরিণত হল। বেঞ্জামিন ওখানে আব না দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাম স্টপেজের দিকে এগোল।

খামখেয়ালী স্বভাবের মেয়েদেব জন্য সময় সময় এই রকম অস্বস্তিকর অবস্থাব মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এখন কি করবে বেঞ্জামিন ভেবে পেল না। তবে একটা সিগারেট ধরাবাব পব, কয়েক টান দিতে দিতে মনে হল, এই ফাঁকে লিণ্ডসে স্ট্রীটে গেলে মন্দ হয় না। 'আহুজা কর্নারে'ব রাতেশ আহুজা গতকাল খবর পাঠিয়েছিল, যাওয়া হয় নি। এখন যাওয়া যেতে পারে। এই রকম ফোন সারানোর প্রাইভেট কাজ মাসে দু-চারটে বেঞ্জামিন করে।

চৌরঙ্গীগামী প্রথম ট্রামেই ও চেপে বসল।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে পামেলা গ্র্যান্ট স্ট্রীটে ঢুকল। ভালোয় ভালোয় কাজ চুকে গেলেও এখনও পা কাঁপছে। এজেন্ট স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, সঙ্গে লোক

দেবেন কিনা। পামেলা কোন রকমে জানিয়েছিল, দরকার হবে না। গাড়িতে অফিসের লোক অপেক্ষা করছে।

তখনকার মত সঙ্গান মুহূর্ত পামেলার জীবনে আর আসে নি। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি অফিস থেকে ফোন আসে—এই বুঝি, আর কোন অঘটন ঘটে। দরদর করে ঘামতে থেকেছে। কেউ তাকে তখন তেমন ভাবে লক্ষ্য করে নি, এই রক্ষে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে অঘটনও কিছু ঘটে নি।

ডান হাতটা অবশ হয়ে আসছে। ব্রীফকেসটা হাত-বদল করল পামেলা। নোট হলেও, পঁয়ষট্টি হাজার টাকার ওজন কম নয়। এই হাঁটাটা অবশ্য ঠিক হচ্ছে না। এই অঞ্চলে নানা ধরনের লোকজন ঘোরাফেরা করে। তাদের মধ্যে কেউ ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে পালালেই তো চিত্তির। তাছাড়া হাঁটতেও হবে অনেকটা।

লিণ্ডসে স্ট্রীট পেরিয়ে, অর্থাৎ গ্লোব সিনেমার পিছনে হল পামেলার গন্তব্যস্থল। ওখানে একটা ছিমছাম গোয়ানিজ হোটেল আছে। ওই হোটেলেই আজকের রাত কাটাতে চায় পামেলা। ভোরের ট্রেনে কলকাতা থেকে সরে পড়বে।

কোথায় যাবে, তাও ঠিক হয়ে আছে।

যাবে বম্বে।

তবে সরাসরি যাবে না। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ভোরে ছাড়ে। ওতে চড়ে আসানসোলে পৌঁছবে। ওখানে পিসি থাকেন। বুড়ো মানুষ চোখেও ভাল দেখতে পান না। কাজের কিছুটা সুবিধাই হবে। কাঁচি আর চিরুণীর সাহায্যে চুলের ডিজাইন একটু বদলে ফেলবে। শাড়ি ছেড়ে স্কার্ট—অর্থাৎ পুরোদস্তুর অ্যাংলো হয়ে উঠবে। ভুলেও বাংলা বলা চলবে না।

বম্বে মেল আসানসোলে আসে গভীর রাত্রে। ওই ট্রেনেই পামেলা রওনা হয়ে পড়বে। পিসিকে অবশ্য বলে যাবে না কোথায় যাচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা সোজা। এরপর আর হিসাব মেলান

যাচ্ছে না। বম্বেতে পৌঁছবার পর, সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে কিভাবে বসবাস করবে।

পাশ দিয়ে একটা রিক্সা যাচ্ছিল। থামিয়ে তাতে চড়ে বসল পামেলা। কোথায় যেতে হবে নির্দেশ দিল। অবশ্য এটা ঠিক, একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে না। সেই পুরুষ বেঞ্জামিন ছাড়া আর কে হতে পারে? তবে হিসাবে একটা ভুল পামেলার হয়েছে। এরকম মোটা অঙ্কের টাকা আজ নয় কাল হাতে আসবে, এরকম আঁচ সে আগেই করতে পেরেছিল। সময় পেয়েও সে বেঞ্জামিনকে একটু একটু করে নিজের মনের ভাব বলতে পারে নি। এখন হঠাৎ বলতে গেলে অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে কে জানে।

পামেলা নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল।

রিক্সা চলেছে নিজের গতিতে। এক সময় থামল নিউ মার্কেটের দেওয়াল ঘেঁষে। রাস্তার অপর পারেই গ্লোব। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রাস্তা পার হল। সিনেমা-হলের পাশের গলিতে এবার ঢুকতে হবে। গলির মাঝামাঝি গেলে তবে হোটেলের সদর দরজা পাওয়া যাবে।

ঠিক এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

বেঞ্জামিন আহুজাদের অফিসে ঢোকার মুখেই থমকে দাঁড়াল। ওধারে চোখ ফিরিয়ে ছিল বলেই দেখতে পেল পামেলাকে। পামেলা তখন গলির মুখে। বেঞ্জামিন স্বাভাবিক ভাবেই অবাক হয়ে গেল। ওকে এই সময় এরকম জায়গায় আশা করার কথা ভাবা যায় না। আহুজাদের অফিসে আর ঢোকা হল না।

বেঞ্জামিন জোরে পা চালাল ওর দিকে।

রিস্টওয়াচের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পামেলা ঢুকে পড়ল হোটেলের ভেতর।

একজন আধবুড়ো লোক সেকেলে কাউণ্টারের সামনে বসে মোটা একটা খাতায় কি সমস্ত লিখছিল। দরজার কাছে আওয়াজ হতেই মুখ তুলল। বলল, বলুন?

ঘর খালি আছে ? আমি একদিনের জন্য থাকতে চাই।

আছে। কোথা থেকে আসছেন ?

ব্যাণ্ডেল থেকে।

সিঙ্গল রুমের ত্রিশ টাকা। দিন, খাতায় নাম-ঠিকানা লিখুন।

লেখালেখি শেষ হবার পর কাউন্টারের লোকটি গলা চড়াল, ওসমান—

বয় এসে দাঁড়াল।

কি বলছেন ?

মেমসাহেবকে একুশ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।

ওসমানের সঙ্গে পামেলা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্জামিন এসে উপস্থিত হল। দূর থেকেই দেখেছে পামেলাকে এই হোটেলে প্রবেশ করতে। ব্যাপারটা ক্রমেই তার কাছে ঘোরাল হয়ে উঠছে।

একজন মহিলা এইমাত্র এখানে এসেছেন—

নির্বিকার ভঙ্গিতে কাউন্টার ক্লার্ক বলল, তা এসেছেন।

উনি কি আপনাদের বোর্ডার ?

হ্যাঁ।

ওঁর ঘরের নম্বরটা বলবেন ?

কেন বলুন তো ?

বেঞ্জামিন আর কথা বাড়াল না। একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরল।

বলা বাহুল্য, কাজ হল।

একুশ নম্বর। বাঁ ধারের প্যাসেজ দিয়ে চলে যান।

করিডরের মাঝামাঝি একুশ নম্বর। বেঞ্জামিন দরজায় করাঘাত করল। কোন সাড়া নেই। পামেলাকে কোনদিন খেলোয়াড় মেয়ে বলে মনে হয় নি। কিন্তু আজকের ঘটনা সমস্ত কিছুকে ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। নানান সন্দেহ উঁকিঝুকি মারছে মনের মধ্যে।

বেঞ্জামিন আবার দরজায় ঘা দিল।

এবার সাড়া পাওয়া গেল।

কে?

দরজা খোল, আমি বেঞ্জ।

দরজা খুলে গেল। দু' পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পামেলার ফ্যাকাসে মুখ। ঘামে আবার জব জব করছে। সুশ্রী মুখ যে সময় সময় বিশ্রী হয়ে উঠতে পারে, এরকম পরিবেশের মুখোমুখি না হলে বিশ্বাস করা কঠিন।

পাশ কাটিয়ে বেঞ্জামিন ভেতরে ঢুকল।

খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?

কাঁপা গলায় পামেলা বলল, তুমি এখানে কিভাবে এলে?

আমারও ওই এক প্রশ্ন, তুমি এখানে কেন?

আমি--মানে--

তেতো হাসিতে বেঞ্জামিনের ঠোঁট বেঁকে গেল: এত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে? আমি তোমার গার্জেন নই, রেজেস্ট্রী অফিস বা চার্চে গিয়ে আমি তোমার স্বামী হয়ে উঠিনি। তোমার যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা আছে। এই ঘরে কারোর সঙ্গে রাত কাটাতে চাইছ? এরকম আরো বহু রাত কাটিয়েছ--বেশ তো, এতে আমার কি বলার থাকতে পারে। আমি কৌতূহল দমন করতে না পারারই দরুণ তোমাকে অনুসরণ করে এখানে চলে এসেছি। সবি পা: । চলি—

বেঞ্জামিন দরজার দিকে এগোল।

বেঞ্জ, দাঁড়াও। প্লীজ—

বেঞ্জামিন দাঁড়াল।

তুমি যা ভাবছ তা নয়। কারোর সঙ্গে রাত কাটাতে এখানে আসি নি। এ ঘর রিজার্ভ করেছি আমি।

কেন?

পামেলা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। হাত রাখল ওর কাঁধের ওপর।

কি হল বল ? অবশ্য বলতে যদি না চাও, জেদ করব না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বেঞ্জ। আমি…আমি…

থেমে যাচ্ছ কেন ? বল —বল—

পামেলা দু'হাত দিয়ে বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরল।

আমি এভাবে জীবন কাটাতে চাই নি বেঞ্জ। প্রাচুর্যের মধ্যে আমার জীবন কাটুক, আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি থাকো আমার পাশে। তাই প্রথম সুযোগেই—

প্রথম সুযোগ !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথম সুযোগ।

পামেলা ছিটকে সরে এল বেঞ্জামিনের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে।

ব্রীফকেসটা রাখা ছিল খাটের ওপর। প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওটা তুলে নিল। ডালাটা খুলে ধরতেই মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল ঝকঝকে নোটের বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল।

এই ধরনের কিছু দেখবার জন্যে বেঞ্জামিন কখনোই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের অতলান্তে ও তলিয়ে যেতে লাগল। বলল কোন রকমে : এ সমস্ত কি ?

খিলখিল করে হাসছে পামেলা। হাসতে হাসতেই বলল, তোমার কি মনে হয়, এই টাকায় আমাদের বাকি জীবন ভাল ভাবে কাটবে না ? উঃ, এতক্ষণে হাল্কা হলাম। তুমি পাশে না থাকায়, টাকাটা হাতে আসবার পর থেকেই ভারি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করল বেঞ্জামিন। দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে বাইরেকার দরজার ছিটকিনি লাগাল। নোটের তাড়াগুলো একে একে তুলে ব্রীফকেসে রাখল। তারপর এসে দাঁড়াল পামেলার সামনে : কোথা থেকে পেলে এত টাকা ?

সেই কথাই আমি তোমায় বলতে চাই।

তাড়াতাড়ি বল, আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না !

পামেলা একে একে সমস্ত কথা বলল।

দিশেহারা বেঞ্জামিন কাঁপা গলায় বলল, তোমার সাহসের প্রশংসা আমি করতে পারছি না। কাজটা তুমি মোটেই ভাল করে নি।

কাজটা ভাল হয়েছে কি খারাপ, এ নিয়ে গবেষণা করা এখন নিরর্থক। তোমাকে আগেই বললাম, ভাল ভাবে আমি বাঁচতে চাই। কেন বুঝতে পারছ না, এই পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আমাদের অনেক আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু—

একুশ নম্বর ঘরে যখন ওই ধরনের কথাবার্তা চলছে, তখন হোটেলের অফিস-কাম-পার্লারের দৃশ্য অন্যরকম। কাউন্টারের ওধারে আধবুড়ো লোকটা—হোটেলের ম্যানেজারও হতে পারে, খাতাপত্রের মধ্যে ডুবেছিল। তার চমক ভাঙল একজনের উপস্থিতিতে।

লম্বাটে গড়ন আগন্তুকের। স্বাস্থ্য-সম্পদে উজ্জ্বল একথা বলা চলে না। আবার ক্ষয়া ধরনের একথাও বলা চলে না। পরনে টেরিউলের স্যুট। ফেল্ট হ্যাট কপালের ওপর সামান্য নামানো। সে কাউন্টার ঘেঁসান দিয়ে দাঁড়াল।

বলুন?

আমার একটা ঘর চাই।

সিঙ্গল্ না ডাব্‌ল?

সিঙ্গল্।

পাবেন। ত্রিশ টাকা পার ডে ভাড়া। নাম-টাম লিখুন এখানে। আপনার মালপত্র কই? বাইরে বোধ হয়? বেয়ারাকে—

কোন দরকার নেই। মালপত্র আনি নি।

আগন্তুক কোটের ভেতরের পকেট থেকে কলম বার করল। বলল আবার, কি রকম পজিসনে ঘর দিচ্ছেন?

পজিসান! বেশ খোলামেলা, হাওয়াদার—

হাওয়াদার?

আগন্তুক রেজিস্ট্রারের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল।

মুখ তুলে বলল, বেশি হাওয়া আবার আমার পছন্দ নয়। সর্দির ধাত। বাইশ নম্বর ঘরখানা আশা করি তেমন খোলামেলা না? খালি আছে তো?

হ্যাঁ। ওই ঘরখানা তাহলে···

নিশ্চয়। একদিনের বেশি থাকব বলে মনে হয় না।

সই-সাবুদ করে টাকা দিল আগন্তুক।

চাবি নিয়ে তারপর চলল বাইশ নম্বর ঘরের দিকে।

ওদিকে—

একুশ নম্বর ঘরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছে বেঞ্জামিন। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে বললে ভুল হবে না। পামেলা তার সুন্দব মুখে আরক্তিম ভাব ফুটিয়ে বসে আছে খাটের ওপর। নোটের বণ্ডিলগুলো এখন আর মেঝের ওপর ছড়ান নেই। তুলে নেওয়া হয়েছে ব্রীফকেসটা রাখা রয়েছে ওর পাশে।

পায়চারি থামিয়ে বেঞ্জামিন বলল, তোমার মত মেয়ে এই রকম মারাত্মক কাজ করে বসবে ভাবতেও পারছি না। যাক, এখন দেখতে হবে কিভাবে শেষ-রক্ষা কবা যায়।

ত্ব'দিন সময় পাওয়া যাচ্ছে। কাল-সকালেই আমি আসানসোল রওনা হয়ে যেতে পারি। ওখান থেকে বম্বে।

বম্বে! মাথা খারাপ। ত্ব'দিন সময় তো ট্রেনেই চলে যাবে। তারপর তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে ওখানে লুকিয়ে থাকা কষ্টকর হবে। কিছু ছোঁড়া তোমার পিছু লাগবে। তুমি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠবে। অনেকে ভাববে এই স্বচ্ছল সুন্দরী ছুঁড়িটা কোথা থেকে এসে জুটল। কৌতূহল তাদের তোমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বাধ্য করবে। মোট কথা, তুমি এমন বাজার গরম করে তুলবে যে, লুকিয়ে থাকা আর হবে না।

পামেলার মনে এত কথা আসে নি।

শুকনো গলায় বলল, তাহলে?

তোমাকে কলকাতাতেই গা ঢাকা দিতে হবে।

এখানেও তো ওই সমস্ত প্রবলেম দেখা দেবে।

যাতে না দেখা দেয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি নিজের বাসায় না ফিরে ভালই করেছ। আমি চাই, এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হোক, যাতে সকলে ভাবতে আরম্ভ করুক, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে বেরোবার পর তোমাকে কেউ গুম করেছে। এরকম ব্যাপারটা দাঁড় করাতে পারলে, পুলিশ তোমাকে খোঁজার পরিবর্তে যে তোমাকে গুম করেছে তাকে খোঁজার চেষ্টা করবে।

তেমন একটা লোক তো চাই?

তোমার সাহায্যকারী। কাজটা হাসিল হয়ে যাবার পর, তোমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে আর কি। তবে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করার জন্য এক আধটা চাল চালতে হবে। সে কথায় পরে আসছি। আগে শোন, কিভাবে গা ঢাকা দেবে।

এতক্ষণ পরে বেঞ্জামিন সিগারেট ধরাল। বসল ড্রেসিং টুলের ওপর।

চুল ছেঁটে-টেটে নয়। চেহারা বদলাতে হবে অন্যভাবে। উইগ্‌স পরবে।

উইগ্‌স !!!

হ্যাঁ। আজকাল তো উন্নত ধরনের সমস্ত উইগ্‌স বেরিয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নকল ধরবার উপায় নেই। দাম চার-পাঁচশ টাকা পড়বে বোধ হয়। পড়ুক। এখন তো টাকার অভাব নেই।

পামেলা দ্রুত গলায় বলল, উইগ্‌স পরার কি দরকার। নিজের চুল একটু এধার ওধার…

তোমার মাথায় কিছু নেই। কাঁচা-পাকা উইগ্‌স পরবে, বুঝেছ? চোখে একটু সেকেলে ধরনের চশমা উঠবে। লিপস্টিক লাগাবে না। আইব্রো পেন্সিল দিয়ে হালকা দু-চারটে দাগ গালের এখানে ওখানে

টানতে হবে। ঢিলেঢালা পোশাক পরবে। অর্থাৎ আমি তোমাকে আধবুড়ি করে তুলতে চাই।

আধবুড়ি হয়ে আমায় কতদিন থাকতে হবে?

যতদিন না আমি কলকাতা থেকে দূরে, কোথাও একটা কাজ জোগাড় করে নিতে পারি। তারপর আর কি? আর দশটা স্বামী স্ত্রীর মতই আমাদের দিন কাটবে। এবার শোন, আধবুড়ি হবার পর তুমি কি করবে।

বল?

পরশু ভোরবেলায় তুমি আমার বাসায় চলে আসবে।

পামেলা আকাশ থেকে পড়ল: তোমার বাসায়!

ঠিক তাই। আমি কথাচ্ছলে প্রতিবেশীদের জানিয়ে রাখব, নাগপুর থেকে মাসি আসছেন। আমার মাসি সত্যি নাগপুরে থাকেন। বছর খানেক তুমি এইভাবেই থাকবে। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবে কম। কারণ তুমি হার্টের রুগী। ততদিনে আমি অন্য কোন প্রদেশে চাকরির চেষ্টা দেখব। মাইনে কম হলেও একটা না একটা জুটে যাবেই। তারপর বুঝতেই পারছ, বাকি জীবনটা—

বুঝলাম। কিন্তু কয়েকটা ঝামেলার ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে।

যথা?

পুলিশ আমাকে ভীষণ খোঁজাখুঁজি করবে। সেই সূত্রে তোমাব বাসাতেও পৌঁছতে পারে তারা। তখন—

পৌঁছতে পারে কি? পৌঁছবেই। তারা আমাকে প্রশ্ন ট্রশ্ন করবে আমার অসুস্থ মাসিকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে যাবে কেন? আরেকটা কাজ অবশ্য করে রাখতে হবে। ওই যে আগে বললাম, ব্যাপারটা হচ্ছে, লোভে পড়ে তুমি টাকাটা সরিয়েছ। তারপরই পড়ে গেছ গুণ্ডাদের খপ্পরে। এটা যাতে পুলিশ আঁচ করতে পারে, তার জন্য তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

তোমার রুম-মেট আছে?

আছে। ন্যান্সি হাওয়ার্ড।

ওখানে ফোন করার কোন সুবিধা আছে।

হাউস লেডির ফোন নেই। বাড়ির নিচের তলায় একটা মেডিক্যাল স্টোর্স আছে। ওখানে ফোন এলে আমাদের ডেকে দেয়।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বেঞ্জামিন বলল, ব্যবস্থা ভালই। আর নয়, কাল সন্ধ্যার পর ন্যান্সিকে ফোনে ডাকবে। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছ, এই রকম ভাবে তার সঙ্গে কিছু কথা বলবে। তারপর জানাবে, পরের দিন বেলা দশটার মধ্যে যদি না ফেরো, তবে যেন পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বুঝলে তো, তুমি যে বিপদে পড়েছ, এরকম একটা অ্যালিবাই এই ভাবে তৈরী হয়ে গেল। এরপর পুলিশ অন্যপথ ধরে তোমায় খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করবে।

বেঞ্জ, তুমি আজকাল খুব ডিটেকটিভ গল্প পড়ছ, বুঝি?

না। মাথা খেলালে এরকম প্লান অনেকেই খাড়া করতে পারবে। এবার বল তো, ফোন করবে কোথা থেকে?

এখানেই তো ফোন আছে।

বেঞ্জামিন প্রায় খিঁচিয়ে উঠল: তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। ফোন আছে কাউন্টারের ওপর। ম্যানেজার না কে ওই লোকটা -সব সময় বসে আছে ওখানে। তুমি যা বলবে, সমস্তই শুনতে পাবে। ব্যস, হয়ে গেল।

হয়ে গেল মানে?

মাথার মধ্যেকার গ্রে ম্যাটার একটু খেলাও পাম। হয়ে গেল মানে, আমাদের প্ল্যানের বারোটা বেজে গেল। লোকটার সন্দেহ তো হবেই, এমন কি পুলিশেও খবর দিতে পারে। ফোন করবে 'লাইট হাউস'য়ের কাছে যে বুথ আছে, ওখান থেকে।

বেঞ্জামিন ঘড়ি দেখে নিল। বলল আবার: তুমি কাল ঠিক সন্ধ্যা ছ'টার সময় বেরোবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোন করে

ফিরে আসবে ঘরে। আমি অবশ্য সে সময় এখানে থাকব। এত গুলো টাকা শূন্য ঘরে রাখা ঠিক হবে না।

পামেলা বলল, এখন তুমি বেরোচ্ছ ?

হ্যাঁ। উইগ্‌স আর তোমার জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করি। হাজার ানেক টাকা ব্রীফকেস থেকে বার কর।

পরশু সকালেই কি আমি হোটেল ছাড়ব ?

খুব সকালে নয়। একটু বেলায়।

পামেলা ব্রীফকেস থেকে টাকা বার করল। ভয় ভয় ভাবটা এখন কটে গেছে। বেঞ্জামিন নাটকীয় ভাবে পাশে এসে দাঁড়ানোতে ামস্ত কিছু বেশ আস্থাজনক হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে, আশঙ্কার য কোন কারণ থাকতে পারে, এখন তা মনেই হচ্ছে না।

বেঞ্জামিন টাকাটা পকেটে রেখে, পামেলাকে একটু আদর করে বদায় নিল।

রণবীর আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছেন। এখন তাঁকে .দখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। কড়া ওষুধ-পত্র চাঙ্গা করে হুলছে। অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাটা এখন একদিনের পুরোন। িতনি ঘরে একা নেই। খাটের হাত কয়েক দূরে খানকয়েক নিচু :রনের চেয়ার রয়েছে। তারই একখানায় সঙ্কুচিত ভাবে আছে মাইকা ার্কেটের ঘোড়েল দালাল সোমেন গুহ।

ডিভানের পাশে রাখা অ্যাসট্রেতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে রণবীর বললেন, তোমাকে কতবার বলেছি, বাড়িতে আসবে না। কথাবার্তা যা হবার অফিসে হবে।

আজ্ঞে, সে কথা আমার মনে আছে।

তবে এলে কেন ? এভাবে চললে তো কাজ .হবে না। কিছু বলবার থাকলে ফোনে বলতে পারতে। যাক, গিয়েছিলে—

সে কথা বলতেই তো এলাম। ফোনে এই ধরনের জরুরি—

দালাল প্রবরের কথা শেষ হল না। ঘরে প্রবেশ করলেন বীরেশ্বর।

পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি থাকায় মনে হচ্ছে বয়সটা যেন আরো কমে গেছে। গুহকে বসে থাকতে দেখে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বললেন তুমি এখানে কি করছ ?

আমতা আমতা করে গুহ বলল, হিসারগড়ের একটা খনি বিক্রি হবে খবর পেলাম। তাই জানাতে এসেছিলাম, মানে—।

ঠিক আছে। পরশু অফিসে এসো। কথাবার্তা যা হবার ওখানেই হবে।

চলে যাবার পরিষ্কার ইঙ্গিত।

গুহ বিদায় নেবার পর বসতে বসতে বীরেশ্বর বললেন, এই সমস্ত লোককে একেবারেই ইনডালজেন্স দিও না। কেমন আছ বল। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় -

রণবীর মৃদু হেসে বললেন, এখন একেবারে ফিট। হঠাৎ কেন যে তখন অসুস্থ হয়ে পড়লাম, বোঝা মুশকিল।

একেবারে ঘাড় মুচড়ে পড়েছিলে।

এক রকম তাই। কানোরিয়ার টাকার ব্যাপারটা সামলেছো ?

হ্যাঁ। ফোন করে তোমার অসুস্থ হয়ে পড়ার কথাটা জানিয়ে বলে দিয়েছি, সোমবারে পেমেন্ট হবে। বাই দি বাই, পামেলা সম্পর্কে একটা কথা ছিল।

পামেলা সম্পর্কে ! –রণবীর অবাক হলেন : বল ?

আমাদের দু'জনের সেক্রেটারি একটি মেয়ে, এটা কেমন যেন বেখাপ্পা ব্যাপার। আমি বলছিলাম, তুমি একজনকে অ্যাপয়েন্ট কর। পামেলাকে আমার জন্যে ছেড়ে দাও।

আসল কথাটা কি বল তো ?

বীরেশ্বর হেসে ফেললেন।

তুমি সব তাতেই মানে খোঁজ. কাজের সুবিধা হবে বলে তোমার কাছে প্রস্তাবটা রাখছি আর কি।

উঁহু। আমি কিন্তু অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছি।

আসল কথাটা তুমি না শুনে ছাড়বে না দেখছি। তুমি অবাক হবে, হয়তো হাসবে, তবু বলছি। কথাটা কি জানো, আমি পামেলাকে বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে!!!

একি! তুমি হাসলে না, অবাক হয়ে গেলে? অবাক হবার এতে তো কিছু নেই সেন। ওয়েস্টার্ন কাণ্ট্রীতে বস'রা সেক্রেটারিদের বিয়ে করেই থাকে। আমি না হয় এদেশেও চালু করে দিলাম।

রণবীর বললেন, এই ধরনের পাগলামী এদেশে অনেক আগেই চালু হয়ে গেছে। তুমি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে পারলে না। মোট কথা, তুমি বিয়ে করছো। এবং পামেলাকেই। এবার বল, আমায় কি করতে হবে?

তেমন কিছু নয়। কাজের জন্যে একটি মেয়ের সন্ধান দেখবে।

ভাল কথা, পামেলা জানে তো তুমি তাকে বিয়ে করতে চলেছ?

বীরেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। মন্থর পায়ে এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ওধারের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে নিলেন, তিনি আসলে কি দেখতে চাইলেন বোঝা গেল না।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, এখনও জানে না। মেয়েদের এমন একটা বয়স আসে, যখন তারা ভবিষ্যতের কথা ভাবে, নির্ভরশীল অভিভাবক খোঁজে। পামেলার এখন সেই বয়স। আমার মত লোকের কাছ থেকে প্রস্তাব পেলে হাতে চাঁদ পাবে, সেন।

রণবীর হাই তুললেন। আড়মোড়া ভেঙে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যাক, বড় রকমের একটা ভোজ তাহলে পেকে উঠল। ভালই। এবার আমরা কাজের কথায় আসতে পারি, কি বল?

মন্দ বল নি। আমিও কয়েকদিন থেকে ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা ভাল চলছে না।

বাইরের ঠাটটা আমরা বজায় রাখতে পেরেছি এই পর্যন্ত। অবশ্য যা লগ্নী আমরা লাগিয়েছিলাম ক্রমে ক্রমে তা তুলে নিতে পেরেছি।

বীরেশ্বর বললেন, লাভটা তুলে নেওয়াই হয়েছে ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার আমাদের টাকা ঢালতে হবে। এমন লাভজনক ব্যবসা মূলধনের ঘাটতিতে নষ্ট হয়ে যাক, এটা দু'জনের কেউই আমরা চাইব না।

কানোরিয়ার টাকাটা বাদ দিলে ব্যাঙ্কে এখন লাখ খানেকের মত আছে।

আরো লাখ চারেক হলে ব্যবসাটা ভালরকম রোল করানো যাবে তুমি দু' লাখ দাও। আমি দু' লাখ দেবো।

রণবীর কিছু বলার আগেই টেলিফোনের ঝনঝনানি শোনা গেল। বীরেশ্বর উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন, হ্যালো —

রণবীর আছে···আছে বীরেশ্বর কথা বলছি···বলুন মিস্টার তালুকদার —

·····

আমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে পেতে চাইছিলেন—বিশেষ কোন কথা আছে কি?

······

বেশ তো···চলে আসুন···ছাড়ছি মিস্টার তালুকদার।

বীরেশ্বর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রণবীর বললেন, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বরেন তালুকদার ফোন করছিল নাকি?

হ্যাঁ। কি সমস্ত কথা বলবেন। গলার আওয়াজ শুনে তো মনে হল বেশ উত্তেজিত। আমি এখানে চলে আসতে বললাম।

বরেন তালুকদার কোম্পানির দুই ডিরেক্টরকে ফোনে কেন

চাইলেন, এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জানতে হলে সময়কে কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঘণ্টাখানেক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘাসের ওপর বসে আড্ডা দেবার পর সুপ্রিয়া আর অরিন্দম উঠে পড়ল। বিকেল পড়ে এসে ঘোর ঘোর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া গুর্জর দেশীয় বায়ুসেবীদের ভিড় বাড়ছিল ক্রমে ক্রমে।

সুপ্রিয়া বলল, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মৃদু হেসে অরবিন্দ বলল, এটা ঠিক জাহান্নামে নয়।

তবে কোথায়?

আমার খিদে পেয়েছে ম্যাডাম। ঘণ্টা দুয়েক ধরে বকে চলেছি। তুমি তো স্রেফ হুঁ-হাঁ করেই কাটিয়ে দিলে। খিদের আর দোষ কি বল না? 'ফেরাজিনি' জায়গা টায়গা না পেলে 'আমিনিয়া'য় গিয়ে বসব ভাবছি।

এবার সুপ্রিয়ার হাসার পালা।

অনুরাগ পর্বে ছেলেরা বলে যাবে, মেয়েরা শুনবে। উত্তর-বিবাহ পর্বে মেয়েরা বলবে শুধু, ছেলেরা মাথা হেঁট করে শুনবে—এটাই হল নিয়ম মুখুজ্যেমশাই। খিদে আমারও পেয়েছে। 'ফেরাজিনি'ই ভাল।

পা চালাও। এখান থেকে লাইট হাউসের দূরত্ব কম নয়।

ওরা মিনিট পনেরোর মধ্যেই লিণ্ডসে স্ট্রীট পার হয়ে হুমায়ুন কোর্ট আর নিউ এম্পায়ার বিল্ডিংয়ের মাঝামাঝি যে প্যাসেজ, তারই মুখে গিয়ে উপস্থিত হল। স্বাভাবিক কারণেই সুপ্রিয়া সামান্য হাঁপিয়ে পড়েছে। কপালে দেখা দিয়েছে চিটচিটে ঘাম।

সুপ্রিয়া বলল, একটু খাওয়াবে বলে কতটা হাঁটালে বলে তো?

কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। যা বুঝছি, আমাদের কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়। ডিরেক্টররা আর মালকড়ি ছাড়তে চাইছে না।

সেকি! দেখে তো—

বাইরের ঠাট বজায় আছে বলেই কিছু মনে হয় না। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। আমি অন্যত্র একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে নিতে পারব।

আমার কি হবে?

সামনের বৈশাখে তোমার বিয়ে হবে। আমার ফ্ল্যাটে চলে আসবে। তখন তোমার কথা বলার পালা। অবিরাম বলে যাবে, আমি মাথা হেঁট করে শুনব।

সুপ্রিয়া হেসে ফেলল।

অরবিন্দ দৃষ্টি তখন এক জায়গায় আটকে গেছে।

আমাদের পামেলা না?

সুপ্রিয়া সামনের দিকে তাকাতেই দেখল, একের পর এক গাড়ি যেতে থাকায় পামেলা ওধারে আটকে গেছে। রাস্তা পার হতে পারছে না। তাকে কিছুটা বিপন্ন দেখাচ্ছে। একটু ফাঁক পেতেই সে রাস্তা পার হয়ে এধারে চলে এল। বলতে গেলে ঠিক তখনই ওদের মুখোমুখি হতে হল। চমকে উঠল পামেলা। ঠিক এই সময় এখানে অফিসের ম্যানেজার এবং সুপ্রিয়াকে সে আশা করে নি। একে কিছুটা নার্ভাস ছিল, এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল বলা চলে।

মিস দত্ত, বোধ হয় সিনেমার টিকিটের খোঁজে রয়েছেন?

অরিন্দমের কথার উত্তরে থেমে থেমে পামেলা বলল, সিনেমার সময় তো পার হয়ে গেছে। আমি⋯ আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

আমরা ফেরাজিনি যাচ্ছি। অসুবিধা না হলে আসুন না।

সুপ্রিয়া বলল, দারুণ হবে—আসুন!

কিছুটা অস্থিরতার সঙ্গে পামেলা বলল, ক্ষমা করবেন। আজ আমার সময় নেই। 'রক্সি'র সামনে একজন অপেক্ষা করে রয়েছেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। তার ব্যবহারে কিছুটা অভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে বলা বাহুল্য।

অরিন্দম আর সুপ্রিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ঘাড় নাচাল অরিন্দম। দু'জনে তারপর এগোল।

ভদ্রমহিলাকে কেমন যেন আপসেট দেখাল।

সুপ্রিয়া বলল, আমারও তাই মনে হল। যাকগে।

দু'জনে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল ফেরাজিনের ভেতরে।

পামেলা এদিকে জোর কদমে এসে থামল কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ের সামনে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপালের চিটচিটে ঘাম মুছে ফেলল। ফিবে গিয়ে ওখান থেকে আর ফোন করা যায় না। ওরা রয়েছে। অন্য একটা বুথ দেখতে হবে। এই সময় মনে পড়ে গেল 'উইমেন ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের' কথা। ওখান থেকে ন্যান্সিকে ফোন করা যেতে পারে। খুব একটা দূরে নয়। এলিট সিনেমা হলের পরের বাড়িটা।

পামেলা পায়ে পায়ে হোস্টেলেব সামনে এসে থামল। ভেতরে ঢুকতে যাবে—

মিস দত্ত, আপনি!

চমকে মুখ ফেরাল পামেলা।

এলিট ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন হৃদয় ভৌমিক। অফিসের ছুঁকছুঁকে স্বভাবের ক্যাশিয়ার। পামেলা বিলক্ষণ বিরক্ত হল। কিছুটা বিপন্নও। আজকে এরকম হচ্ছে কেন? আগে তো পদে পদে এত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হত না! ভদ্রতার খাতিরে পামেলাকে থামতেই হল।

ভৌমিক এসে সামনে দাঁড়ালেন।

সিনেমার টিকিট না পেয়ে কি করব ভাবছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আসুন, 'আমেনিয়ায়' বসে চা খাওয়া যাক।

অন্য আরেক দিন। আজ—

আজ যেতে ক্ষতি কি? অফিসে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না। চা খেতে খেতে গল্পগুজব করা যাবে, চলুন।

পামেলা মনকে দৃঢ় করল ঃ ক্ষমা করবেন ভৌমিকবাবু। আপনার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করার সময় আমার হাতে নেই। ব্যস্ত আছি।

কথা শেষ করেই সে উইমেন ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের ভেতরে ঢুকে গেল।

যা বাবাঃ! চলে গেল।

ভৌমিক দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন।

ছুঁড়িগুলো আমায় পাত্তাই দিতে চায় না। এইভাবে চলতে থাকলে তো আমার বারোটা বেজেই যাবে। নাঃ, বেশ বোঝা যাচ্ছে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আজকের সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে গেল।

বিড়বিড় করতে করতে ভৌমিক রাস্তা পার হলেন। একাই বোধ হয় আমেনিয়ায় ঢোকার বাসনা। মনের দুঃখে চায়ের সঙ্গে আরো কিছু খেয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু অপর ফুটপাথে পৌছবার পরই তিনি থামলেন। একটা কুটিল চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। বাঁকা আঙুল দিয়ে ঘি তোলার পদ্ধতিটা পামেলার ওপর পরখ করে দেখলে কেমন হয়?

ভৌমিক মেয়েদের হোস্টেলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিনিট পনের পরে পামেলা বেরোল। সতর্ক ভাবে এধার ওধার দেখে নিয়ে রাস্তা পেরোল। ততক্ষণে অবশ্য ভৌমিক একটা ট্যাক্সির ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তারপর সতর্ক ভাবে অনুসরণ করে চললেন। শেষ পর্যন্ত যে কি করবেন তিনি বোধ হয় নিজেই জানেন না। অন্ধ আবেগ ওঁকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

গ্লোব সিনেমা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কাটল। অঘটন ঘটল তার পরই। পামেলা পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছিল। ভৌমিকও ঢুকলেন। কয়েক পা এগিয়েছেন, পিছন থেকে বেশ জোরে ধাক্কা মারল কে। ঘুরে পড়ে যাবার মুখে চোয়ালের উপর নেমে এল প্রচণ্ড এক ঘুঁষি। চোখে অন্ধকার দেখলেন হৃদয় ভৌমিক। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একধারে।

'ফেরাজিনি'এ ভিড় একটুই হয়। ভাগ্যক্রমেই বলতে হবে ওরা জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ঘটনাটা মিনিট পনের আগেকার। এখন সুপ্রিয়া আর অরিন্দমের মুখ চলছে। ওই সঙ্গে চাপা গলায় অর্থহীন কথাবার্তার বিরাম নেই। আলোর কারসাজিতে সমস্ত পরিবেশটাই মনোরম।

প্রথমে খেয়াল করেনি অরিন্দম। কে একজন টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ খেয়াল হতেই মুখ তুলে চাইল। চোখাচোখি দু'জনের। মৃদু মৃদু হাসছেন। দোহারা গড়নের মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায় চোখে পড়ার মত টাক। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

কি আশ্চর্য! মিস্টার তালুকদার, আপনার মত লোকও যে এখানে আসেন, এ তো ভাবা যায় না।

ভারিক্কি চালে হেসে বরেন তালুকদার বললেন, আসতে হয় ব্রাদার। সারাদিন হিসাবের কচকচির মধ্যে থাকি তো। সন্ধ্যার পর মাঝে মধ্যে এই সমস্ত জায়গায় না এসে থাকা যায় না।

আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল কিন্তু।

এসেছি অনেকক্ষণ। বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আপনাদের ওপর নজর পড়ল। ভাবলাম ··

ভালই করেছেন। বসুন। আলাপ করিয়ে দিই। সুপ্রিয়া, 'ওভারসিজ' ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার এজেন্ট বরেন তালুকদার। আমাদের অফিসের টাকা-পয়সা ওঁর ব্যাঙ্কেই থাকে। আর—

বলতে হবে না।—হাসি মুখে তালুকদার বললেন, কিছু লোকের পরিচয় না দিলেও আঁচ করা যায়। বেশ আছেন মশাই। বয়স কালে আমরাই কিছু করতে পারলাম না।

সলজ্জ ভাবে অরিন্দম বলল, কালের গতি এখন অনেক দ্রুত নিশ্চয় স্বীকার করবেন।···একি, দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বসুন।

একটু দ্বিধা করে বসে পড়লেন তালুকদার। বললেন, কিছু খেতে

অনুরোধ করবেন না কিন্তু। একগাদা চিংড়ি মাছ পেটের মধ্যে গজগজ করছে।

একথা সেকথার পর অরিন্দম বলল, আজ তো আমার ব্যাঙ্কে যাবার কথা ছিল। মিস্টার সেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়···

আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল একবার।

তার পরই। এখন কেমন আছেন, কে জানে। চেকটা আজ তাই ভাঙান হল না। সোমবার দিন যাব। সঙ্গে অবশ্য বস' এদের সেক্রেটারি পামেলা দত্ত থাকবে। অ্যামাউন্ট বেশ মোটাই বলা চলে।

পঁয়ষট্টি হাজার সামথিং' এর চেক কি ?

হঁ্যা।

মিস দত্ত তো চেকটা ভাঙিয়েছেন। আমার অফিস ঘরে ওঁকে বসিয়ে রেখেছিলাম। টাকাটা নিয়ে যাবার সময় বললাম, সঙ্গে একজন লোক দিই। উনি বললেন, দরকার হবে না।

অরিন্দম আকাশ থেকে পড়ল : আপনি কি বলছেন ? পামেলা টাকাটা ড্র করেছে।

এতে অবাক হবার কি আছে ?

অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে মিস্টার তালুকদার। চেকটা সোমবারের আগে ড্র হবার কথা না। আমি পামেলাকে স্কট করে নিয়ে যাব, এই রকম স্থির হয়ে আছে ! তাছাড়া···

এবার অবাক হবার পালা বাবেন তালুকদাবের : কি বলছেন মশাই ! টাকাটা সত্যি ড্র করেছেন ভদ্রমহিলা। আমি সাহায্য করেছি। চেকেও কোন খুঁত ছিল না। এই ব্যাপারের মধ্যে কি কোন গোলমাল আছে ? পরিষ্কার করে বলুন তো, আসল কথাটা কি ?

এতক্ষণ পরে কথা বলল সুপ্রিয়া, কিছুক্ষণ আগে পামেলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। তখন মনে হয় নি, এখন মনে হচ্ছে, তার চালচলন সন্দেহজনক ছিল। সে আমাদেব এড়িয়ে যেতে চাইছিল।

তোমার কথাই ঠিক।—অরিন্দম বলল, আসল কথাটা কি, এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা ঠিক, টাকাটা সে ক্যাশে জমা করে নি। আদপে ফিরেই আসে নি অফিসে।

তালুকদার বললেন, খটকা লাগিয়ে দিলেন মনে। এ সম্পর্কে এখনই কিছু একটা করা দরকার।

ডিরেক্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সমস্ত কিছু বোঝা যাবে।

তাঁদের এখন পাব কোথায় ?

মিস্টার সেন অসুস্থ। নিশ্চয় বাড়িতেই আছেন। ফোনে কথা বলে দেখুন। নম্বরটা জানেন তো ?

তালুকদার নিজেব অস্থিবতা চাপতে পাবছিলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন বড় বকম জচ্চুবি তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেছে। সাদা কথায় বলতে গেলে তিনি অপরাধীকে সাহায্য করেছেন। ফোন নম্বব নিয়ে, ওখান থেকেই যোগাযোগ কবলেন রণবীর সেনেব সঙ্গে। এই ডাকেই সাড়া দিয়েছিলেন বীরেশ্বব বিশ্বাস।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই তালুকদাব বণবীবের ওখানে পৌছলেন। বীরেশ্বর তাঁকে খাতিব কবে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এজেন্ট মহোদয় যে বিলক্ষণ উত্তেজিত, তা তাঁব হাবভাবেই বুঝতে পাবা যাচ্ছিল।

গুরুতর কিছু ঘটেছে কি ?—প্রশ্ন করলেন বণবীব।

তালুকদার বললেন, ঠিক বলতে পাবছি না। আপনাদের উত্তবেব ওপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। একটা চেক ক্যাশ কবাবাব ব্যাপারে গতকাল আমায় ফোন করেছিলেন, মনে আছে ?

কেন থাকবে না! আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ আর চেকটা পাঠান হয় নি। সোমবার দিন টাকাটা ক্যাশ করান হবে।

ভারি অদ্ভুত কথা বলছেন। টাকাটা ক্যাশ হয়ে গেছে।

রণবীর আর বীরেশ্বর একই সঙ্গে বলে উঠলেন, সেকি!

বাস্তবে তাই ঘটেছে। আপনাদের পামেলা দত্ত চেকটা ভাঙিয়েছেন। ফোনে আগে থেকে খবর পেয়েছিলাম বলে, আমারও তখন সন্দেহ হয় নি।

'রেনবো এন্টারপ্রাইজ'য়ের দুই ডাইরেক্টারের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না কয়েক মিনিট। শেষে বীরেশ্বরই প্রথমে কথা বললেন, এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একজন মেয়ের পক্ষে এমন অসীম সাহসের পরিচয় দেওয়া, বিশেষ করে আমাদের দেশে—এ তো ভাবা যায় না' কিন্তু চেকটা—সেন, চেকটা ওর হাতে গেল কখন?

মহা উত্তেজিত রণবীর বললেন, আমরা কোথায় বাস করছি? এ সমস্ত কি ঘটে গেল! চেকের কথা বলছ? ব্যাঙ্কে যাবার কথা বলতে বলতে চেকটা ওর হাতে দিয়েছিলাম, যতদূর মনে পড়ছে। তারপরই তো অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

তোমাকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চেকের কথা মনে পড়ে নি। এই সুযোগটাই পামেলা নিয়েছে।

ও সমস্ত গবেষণা করে লাভ নেই। তালুকদার বললেন, এখন কি করলেন, তাই স্থির করুন। চোখের ওপর এত বড় অ্যামাউন্ট থেপ্ট হয়ে গেল, সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারলাম না। কি ধবনের এক্সপ্লানে-শনের মুখোমুখি আমায় হতে হবে, এই ভেবেই কাহিল হয়ে পড়ছি।

বীরেশ্বর বললেন, আপনাকে বলতে বাধা নেই মিস্টার তালুকদার, আমাদের ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। এই সময় পঁয়ষট্টি হাজার টাকা চলে যাওয়া···

পুলিশে খবর দিতে হবে। রণবীর বললেন, লালবাজারকে রিং কর।

গিয়ে কথাবার্তা বলাই ভাল। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সৌমেন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

সেই ভাল। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি

আবার তুমি কেন? শরীর খারাপ।

কোন অসুবিধা হবে না। এখন ঠিক আছি।

তালুকদার বললেন, আমি তো ক্রমেই ভীত হয়ে পড়ছি। পুলিশ ভেবে না বসে, এ ব্যাপারের মধ্যে আমিও আছি।

রণবীর বললেন, পুলিশ এরকম ভাবলে বোকামি করবে। আমি ভাবছি, পামেলার কথা। তার মত মেয়ে—বিশ্বাস, একটু আগে ওর সম্পর্কে তুমি যেন কি বলছিলে ?

যেতে দাও ওসমস্ত। মেয়েটির চেহারা আমাকে কিছুটা দুর্বল করে তুলেছিল থাক, ও কথা। যাওয়া যাক এবার। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তিনজন লালবাজারের উদ্দেশে রওনা হলেন।

তখন প্রায় ন'টা।

এলিয়ট রোডের একটা সেকেলে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন সৌমেন চক্রবর্তী। দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত। উঁচু পদেই আছেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই হল তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠি। পামেলার ঠিকানা সংগ্রহ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি।

সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এসেছেন এখানে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কোন জাতের মানুষ এখানে বাস করে না বলেই মনে হল। দরজার মুখেই দেখা হল একজনের সঙ্গে। বয়স হয়েছে। সাদা-মাটা পোশাক। পুলিশের লোক বলে সে মোটেই চিনতে পারল না চক্রবর্তীকে।

পামেলা দত্ত এখানে থাকে কি ?

পামেলা ! বৃদ্ধ বলল, মনে পড়েছে, এখানেই থাকে। তাকে কেন খুঁজছেন, জানতে পারি কি ?

দরকার আছে। কোন তলায় থাকে সে ?

দোতলার শেষের ঘর। মানে, ডান দিকের শেষের ঘর আর কি।

চক্রবর্তী আর কথা না বাড়িয়ে এগোলেন। কয়েক পা যেতেই সিঁড়ি পাওয়া গেল। সোঁদা গন্ধে চারধার ভরে রয়েছে। দোতলায়

পৌঁছেই টানা একটা বারান্দায় উনি পা দিলেন। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক-জোড়া মেয়ে-পুরুষ গল্প করছে। কোন দিকে তাদের খেয়াল নেই। চক্রবর্তী ডান ধারের শেষের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজায় করাঘাত করলেন তারপর।

কে?

দরজা খুলে গেল।

বিস্ময় মাখান মুখ নিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

পামেলা দত্ত এখানে থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি···

আমি তার রুমমেট। ন্যান্সি হাওয়ার্ড। সে কিন্তু এখন ঘরে নেই। কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবে কিনা সন্দেহ।

আপনি কিভাবে জানলেন?

কিছুটা বিরক্ত হয়ে ন্যান্সি বলল, তার আগে জানতে চাই আপনি কে? পামেলার সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আমি পুলিশের লোক। লালবাজার থেকে আসছি।

চক্রবর্তী আইডেন্টি কার্ড বার করলেন।

ন্যান্সি ভয় পেয়ে গেলে। কাঁপা গলায় বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি, সে ঘরে নেই। কিছুক্ষণ আগে তার ফোন পেয়েছিলাম। তখন···

কতক্ষণ আগে ফোন পেয়েছিলেন?

আপনি ভেতরে আসুন, অফিসার। কিছু মনে করবেন না। দরজার সামনে আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে গেলেন।

বেশ গোছান পরিবেশ।

ন্যান্সির অনুরোধে বেতের চেয়ারে বসতে বসতে আগের প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করলেন, কতক্ষণ আগে ফোন পেয়েছিলেন?

ঘণ্টা দুয়েক আগে। আমার মনে হচ্ছে, ও বিপদে পড়েছে, অফিসার !

আপনার এরকম মনে হবার কারণ কি ?

ওর কথাবার্তা ছিল ভীষণ অসংলগ্ন।

কি রকম ?

বলছিল, ভীষণ বিপদে পড়েছে। কয়েকদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে। একজন গুণ্ডা···আসলে ও যে কি বলতে চাইছিল, মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।

শুধু আঁচ করেছিলেন, বিপদে পড়েছে ?

ঠিক বলছেন।

কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চান, বলেছিলেন কি ?

না।—একটু ভেবে ন্যান্সি বলল, বম্বে মেল ধরবে বলছিল।

মিস দত্তর আত্মীয়রা কোথায় কোথায় থাকেন, বলতে পারেন ?

আত্মীয় বলতে তো আছে এক মাসি। আসানসোলে থাকেন।

ধন্যবাদ।

চক্রবর্তী উঠে পড়লেন।

কিন্তু অফিসার, আপনি হঠাৎ পামেলার খোঁজ করতে এখানে এলেন কেন ? সত্যি কি তার কোন···

পরে জানতে পারবেন। ভাল কথা, মিস দত্তর কোন বয়ফ্রেণ্ড আছে ?

বেঞ্জামিন নামে একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব আছে ?

ছেলেটির ঠিকানা জানেন ?

বাড়ির ঠিকানা জানি না। ডালহাউসির টেলিফোন ভবনে কাজ করে শুনেছিলাম।

ওতেই কাজ হবে। চলি।

চক্রবর্তী ন্যান্সির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বম্বে মেলে কোথাও যাবে এরকম কথা যখন শোনা যাচ্ছে, তখন

আসানসোল যাওয়াই সম্ভব। পামেলার একমাত্র আত্মীয়া ওখানেই থাকেন। চক্রবর্তী ঘড়ির দিকে তাকালেন। বম্বে মেল সবেমাত্র হাওড়া ছেড়ে গেছে। অবশ্য এর জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

প্রথম স্টপেজ হচ্ছে বর্ধমান। হাতে বেশ কিছু সময় আছে এখনও। বর্ধমান পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পামেলার চেহারার বিবরণ পাঠালে, তাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হবে না। তবে সমস্ত কিছু কি এত সরল পথ ধরে এগিয়েছে? চক্রবর্তীর মনে একটা সন্দেহ রয়ে গেল।

সাড়ে দশটা বাজতে মিনিট তিনেক আগে, গোয়ানিজ হোটেলের বাইশ নম্বর ঘরের সেই বোর্ডার একুশ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এখনও তার পোশাক আগেকার মতই। ফেল্টের হ্যাট অনেকটা নেমে এসে মুখটাকে অন্ধকার করে রেখেছে—আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি।

সতর্ক ভাবে এধার ওধার তাকিয়ে নিল সে। টানা করিডর জনশূন্য। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। ঘরের মধ্যে থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না অনুভব করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হল। এবার সে নিজের শরীর ঝুঁকিয়ে চাবির ফুটোতে চোখ লাগল।

কাউকে অবশ্য দেখতে পাওয়া গেল না, তবে ঘরে আলো জ্বলছে বুঝতে পারা গেল। অর্থাৎ মেয়েটি এখনো ঘুমোয় নি। বই-টই পড়ছে বোধ হয়। একুশ নম্বরের বোর্ডার চাবির ফুটোর কাছ থেকে সরে গেল। ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে নিল কি সমস্ত। তারপর মৃদু করাঘাত করল দরজায়।

কে?

মৃদু শব্দ ভেসে এল ভেতর থেকে।

আবার করাঘাত।

কে—বেঞ্জ ?

হ্যাঁ।

ছিটকিনি খোলার শব্দ। একটা পাল্লা অল্প সরে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াল পামেলা।

এই রকম একটা সুযোগ খুঁজছিল বোধ হয় বাইশ নম্বর ঘরের বোর্ডার। পলকের মধ্যে নিজের ডান হাতের চেটো দিয়ে পামেলার মুখে ঠেলা মারল।

পামেলা ছিটকে পড়ল ঘরের মধ্যে। খাটের পাশে রাখা টুলটায় মাথা ঠুকে গেল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এই রকম একটা অবস্থা। নিজেকে মনের জোরে সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

আগন্তুক ঘরে ঢুকেই ডান দিকে চোখ ফেরাল। যেমন আশা করেছিল, সুইচ বোর্ড ওখানেই রয়েছে। হোটেলের প্রতিটি ঘরের ভূগোল একই রকম হয়। আলোটা নিভিয়ে দিল হাত বাড়িয়ে। ঘর অবশ্য একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল না। বেডরুম ল্যাম্পটাও জ্বালান ছিল। কি ভেবে ওটা আর নেভাল না।

তার হাতের টর্চ ঝলসে উঠল।

পামেলা কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে। টলছে।

তার কাছে গিয়ে হিসহিসিয়ে উঠল আগন্তুক, টাকাটা কোথায় ?

কাঁপা গলায় বলল পামেলা, কোন টাকা ?

ন্যাকামি করতে হবে না। তাড়াতাড়ি বল। নইলে···

কোন টাকার কথা আমি জানি না। বিশ্বাস করুন !

সজোরে একটা চড় নেমে এল পামেলার গালের উপর। ঝনঝনিয়ে উঠল ওর মাথা। এরপরই আগন্তুকের দুটো হাত আছড়ে পড়ল পামেলার দুই কাঁধের ওপর। ক্রমেই হাতদুটো সরে আসতে লাগল ওর গলার দিকে।

আমার হাতে সময় কম। তাড়াতাড়ি বল টাকাটা কোথায় রেখেছ। নইলে মারা পড়বে !

গলায় এবার চাপ অনুভব করল পামেলা।

বিশ্বাস করুন···

আমাকে ব্লাফ দেবার চেষ্টা কোরো না। আমি সব জানি।

ঠিক এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্য আগন্তুক একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শক্ত কিছুর স্পর্শ পেল সে পিঠের ওপর। বস্তুটা কি অনুমান করেই হিম হয়ে গেল। দরজার ছিটকিনি না লাগানোর জন্যে আক্ষেপ হতে লাগল। স্তিমিত আলোয় পামেলাও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ওর আক্রমণকারীর পিছনে আর একজনের উপস্থিতি।

চাপা অথচ ভারি গলায় ভেসে এল, ওকে ছেড়ে দিয়ে মাথার ওপর হাত তোল। আমার হাতে রিভলবার আছে, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

আগন্তুক জানে, এখন বাচালতা দেখান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হাত সরিয়ে নিয়ে ওপর দিকে তুলল। পামেলা আর নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সেই টুলটাই আবার কপালে লাগল। উত্তেজনা, ভয় আর আঘাত সয়ে যাবার মত অবস্থা তার ছিল না। পামেলা জ্ঞান হারাল।

পামেলা পড়ে যাওয়ায় যে শব্দ হল, তাতে সামান্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় জন। এই সুযোগ গ্রহণ করতে প্রথম জন দ্বিধা করল না। বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুষি চালাল তলপেট লক্ষ্য করে। ঘুষি অবশ্য ঠিক জায়গায় লাগল না। তেরছা ভাবে আঘাত করল। দ্বিতীয় জন কয়েক পা পিছিয়ে গেল অস্ফুট শব্দ করে।

রিভলবারটা কিন্তু ছিটকে পড়ে যায় নি। পড়তে পড়তেও হাতে রয়ে গিয়েছিল। তলপেট বাঁ হাত দিয়ে চেপে সোজা হয়ে দাঁড়াল কোন রকমে। ব্যথাটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করল বোধ হয়। তারপর এগিয়ে গেল কয়েক পা।

প্রথম জনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

একি! মানে—

চুপ! কোন কথা বলবে না। যা বলবার বলব আমি। খাটের ওপর থেকে বালিশটা তুলে নাও।

প্রথম জন এবার বালিশটা তুলে নিল।

কোন রকম চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না। চেম্বারে ছ'টা গুলি ভরা আছে। বালিশটা আমার পায়ের কাছে ফেল।

বালিশটা আস্তে ছুঁড়ে দিল প্রথম জন।

কাঁপা গলায় বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করতে ·

থামো। কথা বলতে তোমাকে মানা করেছি।

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মেঝে থেকে বালিশটা তুলে নিল দ্বিতীয় জন। রিভলবারের চোঙটা বালিশের একধারে ঠেসে ধরে সঙ্গে সঙ্গে চালাল। শব্দের প্রচণ্ডতাকে চাপা দিল তুলোর রাশ। বারুদের গন্ধে ভরে গেল চারধার।

কি ঘটতে চলেছে বুঝতে পারার আগেই গুলিটা গিয়ে লাগল প্রথম জনের বুকের ডান ধারে। মুখ হাঁ হয়ে গেল। আর্তনাদ বেরোবার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেল বোধ হয়। দেহটা তার একপাক ঘুরে গিয়েই মাটির ওপর এলিয়ে পড়ল। সমস্ত কিছু ঘটতে কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগে নি।

দ্বিতীয় জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

রিভলবারটা পকেটে রেখে এবার এগিয়ে গেল সে সুইচ বোর্ডের দিকে।

পামেলা উঠে বসল।

মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীরও কেমন শ্লথ। মনে হচ্ছে, একেবারেই জোর পাবে না। ওর এবার মনে পড়ল লোমহর্ষক ঘটনাগুলির কথা। দু'চোখ দিয়ে ঘরের চারধার এবার ময়না করে নিল। বড় আলোটা জ্বলছে। দুজনের মধ্যে কেউ নেই ঘরে। দরজাটা রয়েছে আধ-ভেজান অবস্থায়।

টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগাল। ভারি ক্লান্ত লাগছে। অপটু শরীরকে কোন রকমে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে। বেসিনের সামনে ঝুঁকে মুখ আর ঘাড় ধুয়ে নিল ভাল করে। এই সময় দৃষ্টি পড়ল রিস্টওয়াচের ওপর। পৌনে চারটে। ভোর হয়ে আসছে। এতক্ষণ মূর্ছিত হয়েছিল ভেবে অবাক হল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর অনুভব করল বালিশ যথাস্থানে নেই। বালিশ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা অবশ্য এখন ওর নেই। কিছুক্ষণ পূর্ণ বিশ্রাম চাই, নইলে শরীরে শক্তি সঞ্চয় হবে না। এই সময় কয়েক আউন্স ব্র্যাণ্ডি খেতে পারলে ভাল হত।

নানা চিন্তা পামেলাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। প্রথম লোকটা ঘরে ঢুকেছিল টাকাটা হাতাবার জন্য এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা গিয়েছিল, তার কথাবার্তা থেকেই। কিভাবে যে টাকার সন্ধান পেয়েছিল ঈশ্বর জানেন। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা? তার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? টাকার গন্ধে কি সেও এসেছিল?

পামেলা বিছানার ওপর উঠে বসল।

টাকাটা জায়গা মত আছে তো?

বিছানা থেকে নেমে, উবু হয়ে বসে, ঘাড় নামিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল! খাটের তলা ফাঁকা, ব্রীফকেস ওখানে নেই। পামেলার বুকের মধ্যেটা হুড় করে উঠল। এত কাণ্ড যার জন্য, সেই টাকাটা উধাও হয়ে গেল? যে দু'জন ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল তাদের মধ্যে কেউ যে টাকাটা নিয়ে সরে পড়েছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ভাবটা আবার দেখা দিল। এতগুলো টাকা পেয়েও হাত ছাড়া হয়ে গেল! বেঞ্জামিনের ওপর রাগ হতে লাগল পামেলার। কলকাতা থেকে সরে পড়লেই ভাল হত। তার প্ল্যান অনুসারে চলতে গিয়েই এই বিপত্তি। নিজের ভবিষ্যৎও আর

অস্পষ্ট নেই। টাকাটা হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। চাকরিতেও আর যোগ দিতে পারবে না। পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াতে থাকবে। রেস্তহীন কতদিন পালিয়ে বেড়াতে পারবে?

বেঞ্জামিনের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

এই সময় পামেলার দৃষ্টি পড়ল মেঝের একধারে। কয়েক ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে। অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এখানে খুনোখুনি ব্যাপার ঘটে গেছে নাকি! পামেলা শিউরে উঠল। এ ঘরে আর এক মিনিট থাকা চলতে পারে না। বিপদ কোন ধার দিয়ে এসে পড়বে কে জানে। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল—সাড়ে চারটে।

খাটের ওপর পড়েছিল ভ্যানিটি ব্যাগ। দ্রুতহাতে তুলে নিল। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুর্বলতা জয় করে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ব্রীফকেস থেকে হাজার তিনেক টাকা বার করে ছিল। পরচুলা ইত্যাদি কিনতে হাজার টাকা দিয়েছে বেঞ্জামিনকে। বাকি দু' হাজার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রয়েছে, এটাই যা ভরসার কথা

পামেলা ঘর থেকে বেরোল।

করিডর সম্পূর্ণ ফাঁকা। বিভিন্ন ঘরের বোর্ডাররা ঘুমের আমেজে বিভোর হয়ে রয়েছেন। ভীত মন নিয়ে পামেলা করিডর পার হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। নিচে নামার পর সেই ঘরটা পার হয়ে বাইরে যেতে হবে, যেখানে কাউন্টারের সামনে হোটেলের ম্যানেজার না কে বসে থাকে।

সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছবার পর অবশ্য কাউন্টারের ওধারে সেই লোকটাকে বসে থাকতে দেখা গেল না। তবে বাইরে বেরোবার দরজার সামনে বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানার ওপর বসে একজন দারোয়ান শ্রেণীর লোক জামা পরতে ব্যস্ত। পামেলাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। দ্রুতগলায় বলল, কিছু বলবেন মেমসাহেব?

আমি একটু বেরোব।

এত ভোরে ?

কাজ আছে। যদি সম্ভব হয়, একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

পামেলা একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে ধরল।

নোটটা ঝটিতে পকেটস্থ করে দরজা খুলতে খুলতে দরোয়ান বলল, ট্যাক্সি পেতে কোন অসুবিধে হবে না। নিউ মার্কেটের সামনেই পাবেন।

রাস্তায় পা দিয়ে পামেলা দ্রুত এগিয়ে চলল। দরোয়ান ঠিকই বলেছিল, ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কলকাতা এখনও গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে নি। চতুর্দিক পরিষ্কার করবার ব্যর্থ চেষ্টায় শুধু কর্পোরেশনের লোকেরা ব্যস্ত রয়েছে। বেঞ্জামিনের বাসায় পৌছোনই এখন পামেলার উদ্দেশ্য।

ট্যাক্সি মিনিট কুড়ি পরেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছলো।

বেঞ্জামিনকে পাওয়া গেল না।

দরজায় তালা ঝুলছে। এত ভোরে কোথায় গেল সে ? চিন্তিত হয়ে পড়ল পামেলা। এদিক রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাটাও ঠিক হবে না। ভেবেচিন্তে নিজের বাসায় যাওয়াই স্থির করল। ন্যান্সির সঙ্গে-পরামর্শ করে দেখা যেতে পারে। ট্যাক্সিটা ছাড়ে নি তখনও। ওতে করেই এলিয়ট রোড পৌছলো। ভয় আর ভাবনায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

নিজের ঘরের সামনে পৌছে হাঁপাতে লাগল।

করাঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। বিস্মিত ন্যান্সি একরকম টেনে ওকে ঘরের ভেতরে ঢোকাল। বলল চাপা গলায়, পুলিশ এসেছিল।

পামেলার দম আটকে আসতে লাগল : কখন?

কাল সন্ধ্যেবেলা এসে তোমার খোঁজ করছিল।

তুমি কি বললে ?

বললাম, ফোন করেছিলে আমায়। কেউ বিপদে ফেলবার চেষ্টা

করছে তোমাকে। বম্বে মেল ধরে কোথাও যাবে। আসানসোলে মাসি থাকে একথাও বলেছি। এবার বল তো, ব্যাপারটা কি ?

সব বলব। তার আগে তুমি বল, কয়েক দিন অন্য কোথাও আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে কিনা ?

ন্যান্সির বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে এটা বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছে না, গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। এই ঘরে দু'জনে বছর পাঁচেক এক সঙ্গে আছে। খাদহীন অন্তরঙ্গতা। ন্যান্সি বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। কিছু একটা এখনই করতে হবে।

মিনিট দুয়েক ভাবার পর বলল, একটা জায়গা আছে। মেটিয়াবুরুজ বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে একটা গীর্জা আছে। ওখানকার পাদ্রী আমার এক কাকা। বুড়ো ভাল মানুষ। ওঁকে যাহোক একটা বুঝিয়ে ওখানে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সেই ভাল আর এক মিনিট সময় এখানে নষ্ট করতে চাই না। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে তোমায় সব কথা বলব।

কিছু জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে নাও।

দ্রুত হাতে কিছু পোশাক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একটা ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে নেবার পর পামেলা আবার বলল, সদর রাস্তা দিয়ে যাব না। পিছনের গলি দিয়ে যাব এখান থেকে।

সেই ভাল।

দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল।

বেলা আটটার সময় সৌমেন চক্রবর্তী পৌঁছলেন রণবীরের ফ্ল্যাটে। হিসাবটা তিনি ভাল মেলাতে পারেন নি। তন্ন তন্ন করে বম্বে মেলের প্রতিটি কামরা খুঁজেও বর্ধমান পুলিশ পামেলার মত কাউকে খুঁজে পায় নি। রূপসী যুবতী যে একেবারে ছিল না তা নয়।

ছিল, তবে তাবা পবিবাবেব অন্যান্যদেব সঙ্গে চলেছে। বাজিয়ে দেখে বুঝতে পাবা গেছে যে তাবা সন্দেহেব অতীত।

এখন অন্য পথ ধবে এগোতে হবে।

এমনও হতে পাবে পামেলা নিজেব বান্ধবীকে ব্লাফ দিয়েছিল। বাইবে সে মোটেই যায় নি। কলকাতাব কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। ওব লাভাবকে খুঁজে বাব কবতে পাবলে কিছু সূত্রেব সন্ধান পাওয়া যেতে পাবে। আবাব এমনও হতে পাবে, এই টাকা হাতানোব ব্যাপাবে লাভাবেব সহযোগিতা আছে।

চক্রবর্তী বেল বাজালেন।

দবজা খুলে দিলেন বণবীব স্বযং। সাগ্রহে প্রশ্ন কবলেন, সন্ধান পেলেন?

না।

ভেতবে আসুন আশা দেখতে পাচ্ছেন কি? এই সময় এতগুলো টাকা হাত-ছাড়া হবাব অর্থই হয় ব্যবসা কিছুটা পিছিয়ে যাওয়া। ভাবি চিন্তাব মধ্যে আছি অফিসাব। একটা কিছু করুন।

সোফায় বসতে বসতে চক্রবর্তী বললেন, চেষ্টাব কোন ত্রুটি হবে না। এখন এলাম মেয়েটিব সম্পর্কে কিছু জেনে নিতে। আপনাব পার্টনাব কোথায়?

বীবেশ্বব অন্য পাড়ায় থাকে। বলেছিল তো সকালেই আসবে। পামেলা সম্পর্কে কি জানতে চান বলুন?

বেঞ্জামিন নামে কাউকে চেনেন?

না তো।

শুনছি, লোকটা পামেলাব লাভাব। ওব সন্ধান পেলে হযতো কাজটা একটু এগুবে। কতদিন পোল মহিলা আপনাদেব অফিসে কাজ কবছেন?

বছব তিনেকেব কিছু বেশি।

ঠিক এই সময়ে বীরেশ্বর দেখা দিলেন। তিনি অবশ্য একা নন, অরিন্দমও এসেছে।

পামেলা বোধ হয় এখনও ধরা পড়ে নি? বীরেশ্বর বললেন, টাকাটা আর পাওয়া যাবে না, কি বলেন মিস্টার চক্রবর্তী?

চক্রবর্তী মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে বললেন, চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি। এখন এসেছিলাম, পামেলা সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের কাছ থেকে জেনে নিতে। · ইয়ে··· এঁকে ঠিক চিনলাম না?

আমাদের কোম্পানির ম্যানেজার অরিন্দম মুখার্জি।

আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। মিস্টার মুখার্জি ঠিক সময় মতই এসে পড়েছেন। সেদিন অফিসে পামেলার অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে আপনিই বোধ হয় বিশদভাবে আমায় বলতে পারবেন। কাইগুলি যদি

শান্ত গলায় অরিন্দম বলল, মিস দত্তর সঙ্গে অফিসিয়াল ব্যাপারে আমার ডাইরেক্ট কোন যোগাযোগ ছিল না। উনি বস-এদের পি-এ। তবে ·

বলুন।

সেদিন উনি অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন আমার অনুমতি নিয়েই।

কি রকম?

আন্দাজ সাড়ে বারোটায় আমি একটা ফোন পেলাম। বেঞ্জামিন নামে কেউ মিস দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। মিস দত্তর মা নাকি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওঁকে ডেকে পাঠালাম। ফোনে কথা সেরে নেবার পর, মার অসুস্থতার কথা বলে উনি যেতে চাইলেন। মিস্টার সেন বা মিস্টার বিশ্বাস, দু'জনের কেউ অফিসে ছিলেন না। কাজেই আমি আপত্তি করি নি।

বেঞ্জামিন সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

কিছুই না।

লোকটাকে চেনেন না মানলাম। ফোনে কথা হবার সময় তার কোন বৈশিষ্ট্য আঁচ করতে পেরেছিলেন ?

ভ্রূ কুঁচকে মিনিট খানেক ভাবল অরিন্দম।

তেমন কিছু নয়। শুধু মনে হয়েছিল, লোকটির সঙ্গে মিস দত্তর ভাল রকম চেনাজানা আছে।

চক্রবর্তী কর্তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রেমিকপ্রবরের ঠিকানা টেলিফোন ভবন থেকে পাওয়া যাবে আশা করছি। তিনিও গা ঢাকা দিয়েছেন কিনা কে জানে। এখন আমি চলি। প্রয়োজনীয় সংবাদ পেলেই আপনাদের জানাব।

উনি বিদায় নেবার পর বেশ কয়েক মিনিট কথা হল না তিন-জনের মধ্যে। রণবীর বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস পুড়িয়ে চললেন। বীরেশ্বর অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। অরিন্দম কি করবে ভেবে পেল না।

এমন খারাপ সময়ের মুখোমুখি আমি জীবনে হই নি।

রণবীরই নীরবতা ভাঙলেন।

বীরেশ্বর বললেন, আমারও ওই এক কথা। এই ধাক্কায় ব্যবসাটা না আমাদের ডুবে যায়।

ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের এখন গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। যে সমস্ত টাকা পড়ে আছে, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি কি বল বীরেশ্বর ?

তোমার সঙ্গে আমি এক মত। মুখার্জি---

বলুন, স্যার।

আমাদের বাজারে কি রকম টাকা পড়ে আছে বলতে পারেন ?

একটু থেমে অরিন্দম বলল, তিনজন পার্টির কাছ থেকে আমরা ভাল টাকাই পাব স্যার। ক্যারেক্ট অ্যামাউণ্ট অবশ্য এই মুহূর্তে বলা শক্ত! তবে···

রণবীর বললেন, মোটামুটিই বলুন?

সোমবার থেকেই—, বীরেশ্বর বললেন, টাকাটা রিয়েলাইজ করবার চেষ্টা করতে হবে।

অরিন্দম মনে মনে হিসাব করছিল। এবার বলল, এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার মত হবে। গত সপ্তাহে পার্টিদের কাছে বাই পোস্টে রিমাইণ্ডার গেছে।

দুই ডাইরেক্টার আঁৎকে উঠলেন।

এত টাকা! রণবীর বললেন, অসম্ভব। এত টাকা কোন মতেই আর ফেলে রাখা চলতে পারে না। চিঠিপত্র আর নয়। আপনি নিজে যাবেন তাগাদায়।

গুহকে এবার ধমকাতে হবে। বীরেশ্বর বললেন, তিনটে পার্টিই ওর দেওয়া। ওখান থেকে মোটা কমিশন খেয়ে বেমালুম চুপচাপ বসে আছে।

রণবীর বললেন, দালালদের ওই তো হল দোষ। অনেক পার্টি যোগাড় করে দেয় বলে বরদাস্ত করে যেতে হয়। মুখার্জি, আপনার ওপরই তাহলে ভার রইল। অফিস খুললেই আপনি লেগে পড়বেন।

ওদিকে—

সকাল প্রায় আটটা। গোয়ানিজ হোটেলের দোতলার করিডরে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। ম্যানেজার শুকনো মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বেয়ারারা এবং হোটেলের অন্যান্য কর্মচারিরা অর্থহীন ব্যস্ততায় ভুগছে। একুশ নম্বর ও বাইশ নম্বর ঘরে পুলিশ কর্মচারিয়া পর্যায়ক্রমে ব্যস্তভাবে যাওয়া-আসা করছেন।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে আরও ঘণ্টা দেড়েক আগে। দুটো ঘরের বেয়ারা একই জন। একুশ নম্বরের বোর্ডার ভোরে চলে গেছেন, এরকম একটা কথা সে শুনেছিল। ওই ঘরে ঢুকেছিল ঝাড়াপোঁছা করতে। মেঝের ওপর কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে থাকতে দেখে গুরুতর সন্দেহ তার মনে জাগে নি।

কিন্তু বাইশ নম্বর ঘরে চা দিতে গিয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে নিজেকে খাড়া রাখতে পেরেছিল। অতি বড় সাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার কথা। মেঝের ওপর হাত -পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। বুকের কাছাকাছি কোটের অংশে রক্ত কালো হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। লোকটি যে মারা গেছে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

হৈ-চৈ পড়ে গেল। ম্যানেজার এসে চিনতে পারলেন, এই লোকটাই বাইশ নম্বর ঘর ভাড়া নিয়েছিল। স্থানীয় থানায় খবর চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা তদন্তর ব্যাপারে হোমিসাইড স্কোয়াডের পুরন্দর সামন্ত তখন থানায় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদটা শুনে তিনিও চলে এলেন ঘটনাস্থলে। জেরা-টেরা যা করবার শেষ হল ক্রমে।

সূত্র বলতে যা বোঝায়, সে রকম কিছু পাওয়া গেল না। একুশ নম্বর ঘরে একজন মহিলা বোর্ডার ছিলেন—ঘরের মেঝেয় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর অতি ভোরে তাঁর সরে পড়ার মধ্যেই রহস্য জমাট বেঁধে রয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

মৃতদেহের পকেটগুলো খুঁজে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ মানুষের সব সময় কাজে লাগে, এমন সমস্ত টুকিটাকি জিনিস ছাড়া পাওয়া গেল গোটা কয়েক কার্ড। ওই সমস্ত কার্ডে মাইকা নিয়ে কারবার করে এমন সমস্ত কোম্পানির নাম ঠিকানা ছাপা রয়েছে।

বরুণবাবু—, সামন্ত বললেন, মনে হচ্ছে, ভিকটিম মাইকা বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ঠিকানাগুলোয় খোঁজ-খবর নিলে লোকটার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

কিছুটা ব্যস্ত ভাবে স্থানীয় ও.সি. বললেন, আপনি ঠিকই বলছেন স্যার। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

আরেকটা কাজ করবেন। বাইশ নম্বর ঘরে যে রক্ত পড়ে আছে—ওই রক্তের সঙ্গে এই লোকটার রক্ত মেলে কিনা পরীক্ষা

করাবেন। আমি এখন চলি। ঘর দুটো সীল করে পাহারার ব্যবস্থা করুন।

সন্ধ্যার মুখে বাসব লালবাজারে পৌঁছল। বাড়িতে বসে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শৈবাল কয়েক দিন কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আসতে পারে নি। ওর সঙ্গে যে গল্প-গুজব করে সময় কাটাবে, সে উপায়ও ছিল না। কিছুটা অতিষ্ঠ ভাবেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছিল। সামন্ত যদি এখনও অফিসে থেকে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে।

হ্যালো···মিস্টার সামন্ত···বাসব কথা বলছি···

ওপাশ থেকে ভরাট গলা ভেসে এল, মিস্টার ব্যানার্জি···আপনার কথাই ভাবছিলাম···

আমার সৌভাগ্য···আমি ফোন করেছিলাম, আপনি এখনও অফিসে আছেন কিনা জানবার জন্যে···ইয়ে···অধমের কথা ভাবছিলেন কেন···

রহস্যে মোড়া একটা লাশ এখন আমার হাতে···এদিকে আপনি চুপচাপ বসে বুদ্ধিতে মরচে পড়াচ্ছেন···ভাবছিলাম···

তাই বলুন···এখনই আসছি···

পনেরো মিনিটের মধ্যে বাসব লালবাজার পৌঁছল।

সামন্ত সাগ্রহে ওকে বসালেন।

ব্যাপারটা বলুন তো এবার?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি। সকালে যখন একটা গোয়ানিজ হোটেলে ডেডবডিটা দেখতে যাই, তখন ব্যাপারটা জটিল বলে মনে হয় নি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পার হবার পর মনে হচ্ছে, কেস তেমন সুবিধার নয়।

কি রকম?

সকালের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার পর সামন্ত বললেন, লোকটার পকেটে গোটা কয়েক কার্ড পাওয়া গিয়েছিল,

আগেই বলেছি। খোঁজ-খবর নিতেই সব কোম্পানির মালিকদেরই পাওয়া গেল। তাঁরা মর্গে এসে বডি সনাক্ত করেছেন। লোকটার নাম সোমেন গুহ। মাইকা মার্কেটের একজন দালাল।

বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। বরং বলা চলে, খানিকটা জট খুলতে পেরেছেন।

তা ঠিক। আবার অন্যধারে জট পাকিয়ে উঠেছে। ওই কোম্পানিগুলির মালিকদের মধ্যে দুজন কথাপ্রসঙ্গে এমন কিছু বললেন, যার দরুণ এই নতুন জট।

কি বললেন তাঁরা ?

বীরেশ্বর বিশ্বাস ভদ্রলোকের নাম। একথা সেকথার পর উনি বললেন, প্রায় ছেষট্টি হাজার টাকা নিয়ে ওঁদের সেক্রেটারি পামেলা দত্ত সরে পড়েছে। পুলিশ কতদূর কি করে উঠতে পারল, সে কথাই উনি এবং ওঁর পার্টনার রণবীর সেন জানতে চাইলেন। তদন্তটা আমার ডিপার্টমেণ্টের নয়, কাজেই ও সম্পর্কে কিছু বলতে পারলাম না। তবে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে উঠল।

আপনি বোধ হয় পামেলা দত্তর চেহারার একটা বর্ণনা নিয়েছিলেন ?

ঠিক তাই। হোটেলের ম্যানেজার একুশ নম্বর ঘরের সেই রহস্যময়ীর যে বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে পামেলার মিল আছে মনে হল। আমার সন্দেহ—যদিও শক্ত প্লিন্থের ওপর এই সন্দেহ বসান নেই। তবু—

আপনি বলতে চান, এই খুনের সঙ্গে যে কোন ভাবে পামেলা দত্ত জড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটির সম্পর্কে কতটা কি জানতে পেরেছেন ?

গোয়েন্দা দপ্তরের চক্রবর্তীকে চেনেন তো ? ওরই হাতে রয়েছে টাকা চুরির কেসটা। চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, পামেলা আসানসোলে মাসির বাড়ি যায় নি। নিজের ঘরে ফেরেনি তার রুমমেট এমন কিছু বলতে পারে নি, যা কাজে লাগে। মোট

কথা, সে উবে গেছে। তবে জানা গেছে, পামেলার একজন লাভার আছে। বেঞ্জামিন ঘোষ। টেলিফোন ভবনে কাজ করে।

বেঞ্জামিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না। বাসায় তাকে পাওয়া যায় নি।

বাসব ভ্রূ কুঁচকে বলল, লোকটার সন্ধান করুন। এখন কথা হচ্ছে, একুশ নম্বরের মেয়েটি যদি পামেলা হয়, তবে শুধু খুন নয়, প্রায় ছেষট্টি হাজার বললেন না—এই টাকাটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

তা তো বটেই। অবশ্য জানি না, আমার ধারণা ঠিক কিনা। একটা অন্য কথা এবার বলছি, এই কেসে আপনাকে নিয়োগ করতে পারে, এমন কাউকে তো দেখছি না। ইয়ে বন্ধু হিসেবে একটু গা ঘামাবেন নাকি ?

বাসব হেসে ফেলল।

আপনার অনুরোধ মানেই তো আদেশ মিস্টার সামন্ত। গা ঘামাব কি বলছেন ? গলে জল হয়ে যাব। তাহলে আর দেরি কেন ? চলুন, উঠে পড়া যাক।

কোথায় ?

আপাতত সেই হোটেলে। তারপর ভেবে দেখা যাবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে দুজনে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এসে উপস্থিত হলেন। জীপ সদর রাস্তায় রেখে, গলি পেরিয়ে হোটেলে ঢুকতেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভীত-ত্রস্ত ম্যানেজার এগিয়ে আসছিল, তাকে সরে যেতে বলার ইঙ্গিত করে সামন্ত বাসবকে নিয়ে ওপরে উঠলেন।

বাইশ নম্বর ঘরখানা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করল বাসব।

এক সময় মুখ ঘুরিয়ে বলল, গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পায় নি নিশ্চয়। হত্যাকারী সাইলেন্সার ব্যবহার করেছিল, কি বলেন ?

সামন্ত বললেন, আপনাকে বলা হয় নি। গুলির আওয়াজ শুনতে না পাওয়ার কারণ সাইলেন্সার নয়, বালিশ। একটা পোড়া দাগওয়ালা ফাটা মাথার বালিশ আমরা এ ঘরে পেয়েছি।

বুঝলাম। বালিশে রিভলবার চেপে গুলি করা হয়েছিল। এখানে আর কিছু দেখার নেই। চলুন, ওঘরে যাওয়া যাক।

পাশের ঘরেও সীল ভেঙে ঢুকতে হল।

বাসব বিছানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, খুন এ ঘরে হয়েছে। দেখুন, বিছানায় বালিশ নেই। তাছাড়া এ ঘরের মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পাওয়া গেছে। বিশেষ কোন কারণে বা নিছক ব্যাপারটা ঘোরাল করে তোলার জন্য মৃতদেহ ওঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি?

আপনিই বলুন।

আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে যদি পামেলাকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হয়, তবে দুটো বিষয় নিয়ে মাথা-ঘামান আরো দরকার। পামেলা কি সোমেন গুহকে নিজের হাতে খুন করেছে? কিম্বা তার সঙ্গে আর কেউ ছিল, যার পক্ষে ওই কাজ করা সম্ভব?

পামেলা নিজের হাতে খুন করে নি বলেই মনে হচ্ছে। কারণ বালিশ টালিশ ম্যানেজ করে যেভাবে গুলি চালান হয়েছে, তাতে কোন মহিলাকে সরাসরি এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা কষ্ট-কল্পনা।

বেশ। আমরা তাহলে ধরে নিচ্ছি, পামেলার একজন সঙ্গী ছিল। এখন অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, সেই সঙ্গীটি রাত্রে কিভাবে ঢুকেছিল এবং কাজ সেরে কিভাবে বেরিয়ে গেছে।

সামন্ত বললেন, ম্যানেজারকে বাজিয়ে দেখতে হবে।

ওই সঙ্গে বেয়ারাদেরও।

বাসব এতক্ষণ পরে পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বলল, আরো একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে। সোমেন গুহ হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছিল কেন এবং

ওই রাতে পামেলার ঘরে ঢুকেছিল কেন? মনে রাখতে হবে, এই প্রশ্ন দুটোর উত্তরের ওপরই হত্যার মোটিভ কি, তা জানতে পারার সম্ভাবনা নির্ভর করছে।

তা তো বটেই। এখন তাহলে—

আমি ঘরটা পরীক্ষা করছি। আপনি গিয়ে বরং ততক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলুন।

সামন্ত বেরিয়ে গেলেন।

বাসব ঘরটা খুঁটিয়ে দেখার ব্যাপারে মনোযোগী হল। দশ মিনিটধরে—মেঝে, চৌকাঠের খাঁজ, আলমারির তলা, বাথরুম—অর্থাৎ সচরাচর যেখানে সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, এমন সমস্ত জায়গা খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পেল না। শেষে বিছানার দিকে দৃষ্টি দিল। মাথার বালিশ ছাড়া সবই আছে। বিছানার চাদর কিছুটা কোঁচকান। তোশকের একপাশটা তুলে দেখল বাসব। কিছু নেই। এবার পুরো তোশকটাই উল্টে ফেলল।

পায়ের দিকে একটা ভাঁজ করা আর ছোট আকারের রিং'য়ে লাগান একটা চাবি পড়ে রয়েছে। চাবিটা তুলে নিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বুঝল, কোন গা-তালার চাবি। চাবিটা পকেটে রেখে দিয়ে, রুমাল দিয়ে সন্তর্পণে ভাঁজ করা কাগজটা মুড়ে ফেলল—পকেটস্থ করল তারপর। পরে পড়ে দেখবে।

নিচে নেমে এসে দেখল, ম্যানেজারের সঙ্গে সবেমাত্র কথা শেষ করে সামন্ত সিগারেট ধরিয়েছেন। বাসব পাইপ ধরাতে ধরাতে জেনে নিল কথাবার্তা আশাপ্রদ কিনা। সামন্ত এমন ভাবে মাথা নাড়লেন যার অর্থের হদিস করা দুষ্কর।

বাসব তবু শুনতে চাইল কি কথাবার্তা হয়েছে।

সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নানা লোকের আনাগোনা হোটেলে। এরা প্রায় সকলেই আসে কোন না কোন বোর্ডারের সঙ্গে দেখা করতে। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে

না ম্যানেজার। বুঝতেই পারছেন, আপনি যার খোঁজ করছেন, এই পথ ধরে এগোলে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

তা না হয় বুঝলাম। হত্যাকারী যদি সন্ধ্যার মধ্যে কাজ সেরে বেরিয়ে যেত, তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু কাজটা যদি মাঝরাত্রে হয়ে থাকে, তবে সে হোটেল থেকে বেরোল কিভাবে। তখন তো দরোয়ানের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, তা বটে। দরোয়ানকে আবার ডাকা যাক। অবশ্য ও বলেছে, মাঝরাত্রে কেউ হোটেল থেকে বেরোয় নি। তবু…

দরোয়ানের আগে ম্যানেজারকে ডাকুন। খুনটা কখন হয়েছে, এ সম্পর্কে আগে একটা ধারণা করে নেওয়া দরকার।

ম্যানেজারকে ডাকা হল।

লম্বাটে গোয়ানিজ মুখ ভয়ে চুপসে গেছে।

বাসব বলল, ভেবে-চিন্তে উত্তর দিন। খুন হওয়ার আগের দিন একুশ নম্বর ঘরের মহিলা হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন?

বিকেলের দিকে বেরিয়েছিলেন।

ফিরে ছিলেন কখন?

আটটা আন্দাজ সময়।

বাইশ নম্বর ঘরের লোকটি বেরিয়েছিল কখন?

সকালে। ফিরে আসেন রাত সাড়ে দশটার পর।

বোর্ডার নয়, এমন কেউ সে সময় হোটেলে ছিল কি?

না, স্যার। দশটার পর হোটেলে বাইরের লোকের থাকার নিয়ম নেই।

আপনি যেতে পারেন।

ম্যানেজার চলে যাবার পর বাসব বলল, ব্যাপারটা পরিস্কার হল। গুহ খুন হয়েছে সাড়ে দশটার পর যে কোন সময়। হত্যাকারী সন্ধ্যার

সময় অন্যান্য ভিজিটারের সঙ্গে গা মিশিয়ে হোটেলে ঢোকে। হয়তো অপেক্ষা করতে থাকে মহিলাটির সঙ্গে একুশ নম্বর ঘরে। তারপর··· যাক, এবার দরোয়ানকে ডাকুন। তাকেও একটু বাজিয়ে দেখি।

খবর পেয়েই দরোয়ান ছুটতে ছুটতে এল।

ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে বেচারা।

নিভে যাওয়া পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এত ঘাবড়ে গেছ কেন?

কাঁপা গলায় দরোয়ান বলল, বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি কিছু জানি না।

তুমি যা জান, তাই নিয়েই আমাদের কথা হবে। সেদিন ভোরে একুশ নম্বর ঘরের মেমসাহেব আগে কেউ হোটেল থেকে বেরিয়েছিল?

না, হুজুর।

মেমসাহেব হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পর, তুমি কি করলে?

দরজার সামনে থেকে বিছানা গুটিয়ে সরিয়ে রাখলাম। তারপর একজন সাহেব এসে পড়লেন।

কতক্ষণ পরে?

দু-পাঁচ মিনিট পরে হবে হুজুর।

তিনিও বোধ হয় বাইরে যেতে চাইলেন?

হ্যাঁ, হুজুর।

ওই সাহেব কত নম্বর ঘরে ছিলেন, বলতে পার?

তা তো পারব না। ওঁকে আগে দেখি নি।

সাহেবকে দেখতে কেমন? ভেবে বল।

দরোয়ান বারকয়েক ঘাড় চুলকে নিয়ে বলল, বেঁটে লোক নয়। মুখে দাড়ি ছিল, চোখে চশমা। গায়ে কোট ছিল হুজুর।

ঠিক আছে। এবার তুমি যাও।

সামন্ত এতক্ষণ পরে বললেন, এই লোকটাকেই আমরা খুঁজছি। প্রথম সুযোগেই হোটেল থেকে সটকে পড়েছে। চশমা আর দাড়ি নকল, কি বলেন?

বলা বাহুল্য। একুশ নম্বর ঘরের মেয়েটিই পামেলা দত্ত, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গেলে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন?

হোটেলের সামনেকার গলিটা পেরোলেই ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড। সেদিন ভোরে কোন ড্রাইভার একজন সুন্দরী মহিলাকে কোথাও পৌঁছে দিয়েছ কিনা খোঁজ নিন।

বেশ। খোঁজ নিচ্ছি। এখানে আর তো কোন কাজ নেই?

না। চলুন।

পরের দিনই সেই ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান পাওয়া গেল। পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। ড্রাইভার একজন মধ্যবয়স্ক বাঙালী। সে পামেলাকে নিয়ে প্রথমে কোথায় গিয়েছিল, তারপর কোথায় গেল ইত্যাদি সমস্ত কথা বলল পুলিশকে।

সমস্ত শোনার পর বাসব বলল সামন্তকে, আমি প্রথমে খোঁজখবর নিয়ে দেখি। আমাকে কেউ আমল দিচ্ছে না বুঝলে, আপনাদের সাহায্য নেব। ভাল কথা, পামেলার সেই লাভারের সংবাদ কি?

কোন সংবাদ নেই। চক্রবর্তী তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বাসব আর লালবাজারে অপেক্ষা করল না। বেলা তখন ন'টা। নিজের ওল্ডস মোবাইলকে দ্রুত ধাবিত করল এলিয়ট রোডের দিকে। সন্ধান টন্ধান নিয়ে যখন নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছল, তখন ন্যান্সি অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। বাসবকে দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। এ আবার কোন আপদ।

আমি অবশ্য পুলিশের লোক নই,—বাসব বলল, তবে লাল-

বাজারের সমর্থন আমার পিছনে আছে। আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে নিঃসন্দেহে বিপদ ডেকে আনবেন। শুনুন, মিস, আপনার বান্ধবী পামেলা দত্ত চুরি ও খুনের কেসের সঙ্গে জড়িত। আমি তাঁর সম্পর্কেই কিছু জানতে এসেছি।

শুকনো গলায় ন্যান্সি বলল, যা বলার আমি পুলিশকে বলেছি।

জানি। তবে একটা কথা বলেন নি।

কোন কথা?

পামেলা আপনার কাছে ফিরে এসেছিল। আপনি একথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেন নি।

যথাসম্ভব গলায় দৃঢ়তা এনে ন্যান্সি বলল, বাজে কথা। পামেলা আমার কাছে এলে আমি নিশ্চয় পুলিশকে সে কথা জানাতাম।

কথাটা যে বাজে নয় আপনি ভালই জানেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের জানিয়েছে, পামেলাকে সে এখানে নিয়ে এসেছে।

এসে থাকতে পারে এখানে, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কিছু মনে করবেন না। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি—

কাজটা ভাল করলেন না। আমাকে সত্যি কথা বললে, বিপদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতে পারতেন। ভাল কথা, কোন অফিসে কাজ করেন?

'মর্গান অ্যাণ্ড পেরি'! স্টিফেন হাউসের দোতলায় আমাদের অফিস।

চলি।

বাসব ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট চলে এল। নিজের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এনায়েৎ তখন একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। অন্ধকার দুনিয়ার এই লোকটিকে বাসব বহুবার কাজে লাগিয়েছে। সুফল পাওয়া গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। ওকে দেখে এনায়েৎ মুখে হাসি টেনে এগিয়ে এল।

কোন ঝামেলা বেঁধেছে মনে হচ্ছে, স্যার?

মৃদু হেসে বাসব বলল, ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে থাকাই তো আমার কাজ এনায়েৎ। এখন শোন, তোমায় কি করতে হবে।

বলুন।

তার আগে জানিয়ে রাখি, এই কেসটায় আমি পুলিশকে সাহায্য করছি। কোন পার্টি আমাকে নিয়োগ করে নি।

আপনি কুণ্ঠিত হবেন না স্যার। অনেক দিয়েছেন আমাকে। একবার না হয় মালকড়ি কিছু পেলাম না। এবার বলুন, কাজটা কি ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, গুরুতর কিছু নয়। একটা অ্যাংলো মেয়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। তোমার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে এখনই চল, তার অফিসের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই। মেয়েটিকে চিনিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

দাঁড়ান—দেখি, ভাইপোটা কোথায় গেল।

এনায়েৎ এধার ওধার তাকাল।

করিম—আরে করিম, এদিকে শোন—

লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে একটা ছোকরা এগিয়ে এল।

দোকানে বোস। আমি বেরোচ্ছি। চলুন, স্যার।

তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

কেন কে জানে, শৈবাল এখনও আসে নি। বাসব সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানছিল। অফিসে ঢোকার মুখেই ন্যান্সিকে চিনিয়ে দিয়েছ এনায়েৎকে। জোঁকের মত মেয়েটার পিছনে ও লেগে আছে সন্দেহ নেই। এখন কিছু প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া গেলে বেঁচা যায়।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বাসব রিসিভার তুলে নিল, হ্যালো—কে কথা বলছেন—

আমি স্যার এনায়েৎ। অফিস থেকে বেরিয়েই ছুঁড়িটা একটা

ট্যাক্সি ধরল—আল্লার দয়ায় আমিও স্যার একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। লম্বা দৌড় দিয়ে ছুঁড়িটা এখন মেটেবুরুজের গীর্জায় এসে ঢুকেছে—

আর, কিছু—

গীর্জার পিছন দিকে একটা বাংলো আছে স্যার—

তুমি বাংলোর কাছাকাছি যেতে পেরেছিলে নাকি?

একগাল হেসে এনায়েৎ বলল, না গিয়ে থাকতে পারলাম না, স্যার। হাত-পা একটু ছেঁচড়ে গেছে অবশ্য। পিছন দিকের পাঁচিলটা টপকাতে হল কিনা। জানলা দিয়ে দেখলাম, আরো একটা সুন্দরী ছুঁড়ি আর একটা ছোড়া রয়েছে। তিনজনের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা হচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও শুনতে পাই নি।

চমৎকার কাজ করেছ এনায়েৎ। আমি আসছি।

আপনি পাঁচিল টপকাবেন, স্যার?

না। গেট দিয়ে যাব। গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আসছি।

আধ ঘন্টার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় বাসব পৌঁছল। ছোট আকারের গীর্জা। পাঁচিল ঘেরা কম্পাউণ্ড বেশ বড় বলতে হবে। নানা ধরনের প্রচুর গাছপালা। মরচে ধরা ছোট গেটটা পেরিয়ে দুজনে ঢুকল ভেতরে। গীর্জার ঘষা কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে আবছা আলো বাইরে এসে পড়েছে। অর্গানের মৃদু বাজনা ভেসে আসছে।

গীর্জাকে বেশ কিছুটা ওপাশে রেখে দুজনে গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে থামল বাংলোর সামনে। অ্যাসবেস্টসে ছাওয়া ছোট আকারের বাংলো। সামনে কাঠের বেড়া দেওয়া এক চিলতে বারান্দা। জানলার মধ্যে দিয়ে যথার্থই দেখা যাচ্ছিল, দুজন যুবতী এবং একজন যুবককে। বাসব স্যান্সিকে চিনতে পারল।

অন্যজন কি পামেলা? চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাতে

তাই মনে হয়। আর ওই যুবক? না, দ্বিধার আর অবকাশ নেই। এনায়েৎকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে বাসব বারান্দায় উঠে এল। তারপর মৃদু করাঘাত করল দরজায়।

কে?

সাড়া না দিয়ে বাসব আবার করাঘাত করল।

দরজা ফাঁক হল। যুবক মাথা বার করে বলল, কাকে চাই?

আপনাদের।

আপনাকে কিন্তু···

মিস ন্যান্সি আমাকে চিনতে পারবেন।

বাসব বাঁ হাত দিয়ে একটা পাল্লা সরিয়ে দিল। ন্যান্সি কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। বাসবকে দেখেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পামেলার কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে নি কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে। সে পায়ে পায়ে পিছুতে আরম্ভ করল। ওধারের দরজা দিয়ে এখান থেকে সরে পড়াই তার উদ্দেশ্য।

বাসব তীক্ষ্ণ গলায় বলল, দেখা যাচ্ছে, আমার হিসাবে ভুল হয় নি। মিস দত্ত, পালাবার চেষ্টা করবেন না। ফল এতে আরো খারাপ হবে। আপনি বোধ হয় বেঞ্জামিন ঘোষ?

বেঞ্জামিন কাঁপা গলায় বলল, আপনি কে?

একজন বেসরকারী গোয়েন্দা। গোয়ানিজ হোটেলের মার্ডার কেসে আমি পুলিশকে সাহায্য করছি। মিস ন্যান্সি, আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করেছেন। মনে রাখুন, এটা একটা বড় অফেন্স। এনায়েৎ --

এনায়েৎ এগিয়ে এল।

তুমি থানায় চলে যাও। ও-সি'কে আমার কথা বলবে। উনি যেন তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসেন। ভাল কথা, লালবাজারে ফোন করতে ভুলো না। এঁদের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে বা হবে, এই ধরনের একটা কথা যেন শুনছিলাম।

পামেলা দ্রুত এগিয়ে এল। কাকুতি ঝরা গলায় বলল, প্লিজ, পুলিশে খবর দেবেন না বিশ্বাস করুন, খুন আমি করি নি। একজন পুরুষ মানুষকে খুন করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু—

এনায়েৎ, দাঁড়িয়ে যাও। এঁরা কি বলতে চান, আগে শুনে নিই।

কথাটা শেষ করে বাসব একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

ব্যাপারটা কি এবার বলুন তো মিস দত্ত ? নিজের হিত যদি চান, কোন কিছু লুকোবার চেষ্টা করবেন না। খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু শুনতে চাই।

তুবার ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বলতে আরম্ভ করল পামেলা। কোন কিছু না লুকিয়ে প্রথম থেকে বলে গেল সবই। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসব একাগ্র মনে শুনে গেল। শুনে গেল তুর্বার লোভে যে ঘটনার সূত্রপাত, কিভাবে তা রক্তাক্ত অবস্থায় পরিণতি লাভ করেছে। বলা শেষ করে পামেলা ভয়মিশ্রিত বিমর্ষতা নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। বাসব দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে এবার বেঞ্জামিনের দিকে তাকাল।

আপনি কিছু বলুন ? .

আমি !—বেঞ্জামিন ইতস্তত করে বলল, আমার অবস্থা নিশ্চয় আপনি অনুমান করছেন। পামেলা এরকম একটা ঝামেলা বাধিয়েছে জানতে পারার পরই আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ওকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে। কাজটা বে আইনী জানি। তবু -

খুবই স্বাভাবিক,—বাসব গলায় সহানুভূতির আমেজ মাখিয়ে বলল, তু'জনের মধ্যে যখন গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন আপনি মিস দত্তর জন্য নিশ্চিত ভাবে ব্যস্ত হবেন। যা হোক, আমাকে সমস্ত খুলে বলুন। টাকা চুরির সঙ্গে খুনের ব্যাপারটা জড়িয়ে পড়ায় কেসটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, নিশ্চয় স্বীকার করবেন ?

বিমর্ষ ভাবে বেঞ্জামিন বলল, আমার কথা শুনে আপনার কি

লাভ হবে, জানি না। এই কেসের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কি, তাও বুঝতে পারছি না। তবু যখন শুনতে চাইছেন, বলছি।

বলুন ?

পামেলা আমার সাহায্যে হোটেল থেকে বেরোলেও, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে আমাকে দাঁড়াতে বলে চলে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওর অফিসে এসে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। বেশ রাগ হয়ে গেল। এ ধরনের ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, সময় যাতে অকারণে নষ্ট না হয়, তাই লিণ্ডসে স্ট্রীটে গেলাম একটা সাইড-ওয়ার্ক সারতে। ওখানে পৌঁছবার পরই পামেলাকে দেখতে পেলাম গ্লোবের সামনে রিক্সা থেকে নামছে। অবাক হয়ে ওর পিছু নিয়েই হোটেলে পৌঁছলাম। এর পরের ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন, পামেলা আমাকে সব কথা বলল, টাকা দেখাল। আমি অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়লাম। পামেলা-কে কিভাবে বাঁচান যায়, তাই নিয়ে দ্রুত চিন্তা করে স্থির করলাম, বম্বে নয়, ওকে লুকিয়ে থাকতে হবে এখানেই। এবং আমার এক প্রৌঢ়া আত্মীয়া সেজে আমারই ফ্লাটে। উইগ্‌স ইত্যাদি কেনবার জন্য তখন বেরিয়ে পড়লাম। স্থির হয়ে রইল রাত্রের দিকে আসব।

এরপর বেঞ্জামিন যা বলল, তা ঘটেছিল নিম্নরূপ- -

সাড়ে আটটা বাজতে তখন কয়েক মিনিট বাকি।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওধারের স্টপেজে ডবল ডেকার থেকে নেমে গ্লোবের ফুটপাথ ধরে বেঞ্জামিন এগিয়ে চলল। বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা মত কাজ না এগোলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। এখন শুধু পামেলা নয়, সেও ফেঁসে যাবে। গজ দশেক এগিয়েছে সবে—

একটা কথা ছিল—

বেঞ্জামিন চমকে উঠেছিল। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, স্যুট-পরা একজন লোক ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটার মাথায়

ফেল্ট হ্যাট, মুখে ঘন দাড়ি, চোখে চশমা। আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

সে আবার বলল, ব্যস্তভাবে কোথায় চলেছেন? গোয়ানিজ হোটেলে নিশ্চয়?

বেঞ্জামিনের ভ্রূ কুঁচকে উঠল: কে আপনি?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, এমন কেউ।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

না। কিছুক্ষণ পরে পামেলা দত্তর কাছে গেলে কোন ক্ষতি হবে না আসুন, ততক্ষণে আমরা দু'জন একটু আলাপ করে নিই।

বেঞ্জামিন এবার বেশ ঘাবড়ালো।

লোকটা গোয়ানিজ হোটেল আর পামেলার কথাও জানে!

চশমাটা নাকের ওপর ভাল করে বসিয়ে নিয়ে আগন্তুক বলল, ভাবছেন, আমি আরো কি জানি? অনেক কিছুই জানি। পামেলা দত্ত গোয়ানিজ হোটেলে গা ঢাকা দিয়ে আছেন যেমন জানি, তেমনি জানি, কোম্পানির বহু হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবার কথা।

আপনি কে? চাইছেনটা কি?

আপাতত দুটো কথা বলতে চাইছি আপনার সঙ্গে। এতে আপনার লাভই হবে। পরিচয় এখন আর দেব না। ওতে তো আপনার কোন লাভ নেই।

কি বলতে চান, বলুন?

রাস্তার মাঝখানে সব কথা বলা যায় না। সঙ্গে গাড়ি আছে গাড়িতে বসে ভালভাবে কথা হবে!

কিন্তু···

পামেলা দত্তর বর্তমান ঠিকানা লালবাজার জানতে পারুক, আপনি নিশ্চয় চাইবেন না?

না···মানে···

আসুন, গাড়িতে।

নীল রঙের মার্কি টু ফুটপাথ ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল। গাড়িতে বসল দু'জনে। কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে আগন্তুক স্টার্ট দিল। চাকা চারটে গড়িয়ে চলল জহরলাল নেহেরু রোডের দিকে।

একি! আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ভিক্টোরিয়ার পেছনে। নিরিবিলিতে কথা হওয়াই ভাল। বুঝতে পারছেন না, আমারও কিছু স্বার্থ রয়েছে। তাই তো আপনার লাভারের অবস্থানের কথা এখনও পুলিশকে জানাই নি। আসুন, একটু কফি খাওয়া যাক।

দুজনের মধ্যে, সিটের ওপর একটা ফ্লাস্ক পড়েছিল।

আগন্তুক এক হাত ষ্টিয়ারিংয়ের ওপর রেখে, অন্য হাত দিয়ে ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে বলল, ঢালুন—

এ সমস্ত কি যে হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

নার্ভাস হবেন না। সব বুঝতে পারবেন। একটা ভাল প্রস্তাবই আপনার কাছে করব। নিন, কফিটা খেয়ে নিন। তারপর আমাকে ঢেলে দিন।

বেঞ্জামিনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কোন জমজমাট নাটকের একটার পর একটা দৃশ্য যেন সে আজ দেখে চলেছে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে সে কাঁধ নাচাল। দেখাই যাক না, লোকটা কি বলে। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ফ্লাস্কটা নিয়ে ঢাকনা খুলল। কালচে বাদামি রঙের পানীয় ঢালল ঢাকনায়। চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে। অনিচ্ছার সঙ্গেই এক ঢোক খেল। গাড়ি তখন প্রায় ভিক্টোরিয়ার পিছনে। দ্বিতীয়বার চুমুক দেবার পরই বিপত্তি ঘটল। মাথা ভয়ঙ্করভাবে ঘুরে উঠল। ঢাকনা সমেত কফি হাত থেকে খসে গিয়ে ট্রাউজার ভিজিয়ে তুলল। কিছু একটা ধরতে গেল বেঞ্জামিন, তারপরই তার মাথা সবেগে নেমে এল ড্যাসবোর্ডের কাণায়।

বেঞ্জামিন নিজের স্মৃতিচারণ শেষ করার মুখে :

আবার যখন জ্ঞান হল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। ভিক্টোরিয়ার পিছন দিকে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। উঠে বসলাম। ঝিমঝিম করে উঠল মাথা। কফির সঙ্গে কিছু মেশান ছিল, বুঝতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। তবে কাছ থেকে কিছু খোয়া যায় নি। লোকটা কে··· পামেলার কথা মনে হতেই চনমনে হয়ে উঠলাম। এখনই একবার ওর কাছে যাওয়া দরকার। কোন রকমে উঠে দাঁড়ালাম। আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনি অনুমান করতে পারছেন। ছুটলাম লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে। হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, লোকজনের বেশ ভিড়। পুলিশও রয়েছে। ভয়ে মনের মধ্যেটা হিম হয়ে এল। তারপর লোকমুখে শুনলাম, একজন খুন হয়েছে। পুলিশ একজন সুন্দরী বোর্ডারকে সন্দেহ করছে। কিন্তু সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর সময় নষ্ট না করে

ওখান থেকে সরে পড়লাম। বিশ্বাস করুন, আর আমি কিছু জানি না।

এখানে পৌঁছলেন কিভাবে ?

মিস হ্যান্সির দয়ায়। কেন জানি না, আমার ধারণা পামেলা সম্পর্কে উনি অনেক কিছু জানেন। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর এখানকার ঠিকানা পেয়েছি। বিশ্বাস করুন, এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

আচ্ছা, ওই গাড়িটা, মানে—যাতে চড়ে আপনি লোকটার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার পিছনে গেলেন, তার নম্বর লক্ষ্য করেছিলেন !

না। মার্ক-টু। রংটা মনে আছে। গাঢ় নীল।

এতক্ষণ পরে পামেলা কথা বলল : আমার কি হবে মিস্টার···

ব্যানার্জি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরাবার ব্যাপারে আপনি সরাসরি অভিযুক্ত। এরপর আছে খুনের কাণ্ডটা। এক্ষেত্রে···

খুন সম্পর্কে আমি বিন্দু-বিসর্গ জানি না। জ্ঞান হবার পরই টাকাটা উধাও হয়েছে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর মেঝেতে

রক্ত পড়ে থাকতে দেখে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেলাম। ওখানে আর অপেক্ষা করা ভাল মনে করি নি, তাই···

দৈনিক পত্রের দৌলতে নিশ্চয় জানতে পেরেছেন, কে খুন হয়েছে?

হ্যাঁ। সোমেন গুহ। আমাদের অফিসে লোকটা যাতায়াত করত। একজন দালাল।

সেদিন যে লোকটা আপনার ঘরে ঢুকল—টাকার জন্য তম্বি করল, তাকে সোমেন গুহ বলে মনে হয় নি?

তখন আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। অন্য কিছু ভাবতে পারি নি। তাছাড়া তার মুখ ঢাকা ছিল। বড় আলো নিভিয়ে দিয়েছিল সে।

দ্বিতীয়জন সম্পর্কে এবার কিছু বলুন।

দ্বিতীয়জন সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে পারব না। মনের অবস্থা তখন এতই শোচনীয় ছিল যে কোন কিছুই লক্ষ্য করি নি। তাছাড়া দ্বিতীয়জন আসার পরই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আমায় এবার খুলে বলুন। আমি জানতে চাইছি, সেদিন ঘটনাটা কিভাবে গড়িয়েছিল।

পামেলা বলল একে একে সমস্ত কথা।

বাসব একাগ্র মনে সমস্ত কিছু শোনার পর পকেট থেকে ভাঁজ করা ছোট আকারের একটা কাগজ বার করল। এ সেই কাগজ যেটা হোটেলের একুশ নম্বর ঘরের—পামেলা যে ঘরে ছিল তার তোশকের তলায় পাওয়া গিয়েছিল।

এই কাগজটা দেখুন তো।

পামেলা কাগজটা হাতে নিল।

এটা তো একটা বিল।

হ্যাঁ। নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু লাক্সারী গুড্স কেনা হয়েছে। এই বিলটা আমি হোটেলে, আপনার বিছানার তোশকের তলায় পেয়েছি। এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন?

কিছুই না। এই বিলটা প্রথমবার আমি দেখছি।

আপনার জ্ঞান হবার পর বিছানার অবস্থা কেমন দেখেছিলেন!

ঘাঁটা অবস্থায় ছিল। মনে হয় বিছানা উল্টেপাল্টে কেউ কিছু খুঁজেছিল।

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। মনে হয় সেই সময় তার পকেট থেকে এই বিলটা পড়ে গিয়েছিল। যা হোক, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। এবার আসি।--বাসব দরজার দিকে এগোল।

পথরোধ করল পামেলা।

আমার কি হবে, মিস্টার ব্যানার্জি?

আপনার!

বিশ্বাস করুন, লোভে পড়ে টাকাটা নেওয়া ছাড়া, খুনোখুনির কিচ্ছু জানি না।

অপরাধ একটা আপনি করেছেন, এবং তা বেশ গুরুতর আকারেরই। আইন আপনাকে ক্ষমা করতে পারে না তবে আপনার কোম্পানির কর্তারা যদি কেসটা তুলে নেন, বেঁচে যেতে পারেন।

কেসটা কি ওঁরা তুলে নেবেন?

অনেক টাকার ব্যাপার। কেসটা তুলে না নেওয়াই সম্ভব। তবে পুরো টাকাটা যদি ওঁরা ফেরৎ পান বা আপনি যদি শোধ করে দিতে পারেন, তাহলে মনে হয় অসুবিধা হবে না। চলি। ভাল কথা, আমি অবশ্য কাউকে কিছু বলব না, তবু আপনি এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বিপদের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে তুলবেন না।

বাসব উত্তরের অপেক্ষা না করেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রণবীর সেন বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিন্তিত মুখে পার্টনার বীরেশ্বর বিশ্বাসের দিকে

তাকালেন। বীরেশ্বরের মুখের অবস্থা তেমন ভাল না। কেমন থমথম করছে। আড়ষ্ট ভাবে তিনি বসে আছেন।

বিশ্বাস, কিছু বল।

বীরেশ্বর কাঁধ ঝাঁকালেন।

বলার মত তো আব কিছু রইল না। আমরা ডুবতে বসেছি। সোমেন গুহ যে আমাদের এমনভাবে ডোবাবে, কে জানত। ভুয়ো সমস্ত কোম্পানি খাড়া কবিয়ে টাকা অ্যাডভান্স করিয়েছে—আমরা তাকে বিশ্বাস করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, ভাবতেও ভয় করছে?

পামেলাও আমাদের কম ডোবায় নি? তোমার কি মনে হয়, টাকা-পয়সা সরাবার ব্যাপারে গুহর সঙ্গে মেয়েটার যোগ ছিল?

পুলিশের কথা তো শুনলে। পামেলা ওই গোয়ানিজ হোটেলেই ছিল, যেখানে গুহ খুন হয়েছে। পরেব দিন সকালে চম্পট দিয়েছে।

সিগাবেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে রণবীর বললেন, দু'জনের মধ্যে যদি যোগাযোগই থাকবে, তবে গুহ খুন হতে যাবে কেন?

এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না! পামেলার আরো কোন ঘনিষ্ঠ লোক গুহকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পুলিশের মুখ থেকে শুনলে না, পামেলার লাভারকে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।—ও কথা এখন থাক, ব্যবসাটার কি হবে, তাই নিয়ে এখন মাথা ঘামান যাক।

আমি তো কোন কূল পাচ্ছি না। গুহ আর পামেলার কাণ্ড কারখানায় কোম্পানি প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। এই ধাক্কাকে সামাল দেবার মত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এখন তোমারও নেই, আমারও নেই।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বীরেশ্বর বললেন, এক্ষেত্রে কোম্পানি তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেন, কত আশা নিয়ে ব্যবসাটা আমরা গড়ে তুলেছিলাম। এগোচ্ছিলও দুরন্ত ঘোড়ার মত। তারপর···

ভাগ্য বিরূপ হলে এই রকমই হয় ভাই। আমি ভাবছি, কর্মচারিদের কথা। এই দুর্দিনে এতগুলো লোক বেকার হয়ে যাবে।

উপায় কি ? এই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎটাও ভাবতে হবে।

নিশ্চয়। তুমি নিজে কিছু ভেবেছ ?

নিতান্তই যদি কোম্পানি তুলে দিতে হয়, আমি বম্বে চলে যাব। ওখানে নিজের ভাগ্যটা একবার যাচাই করে দেখব।

ম্লান হেসে রণবীর বললেন, তার মানে, তুমি আর আমার সঙ্গে থাকতে চাইছো না। এত দিনের বন্ধুত্বের মাঝে তুমি পাঁচিল গেঁথে দিতে চাও। ভাল কথা। এবার আমিও নিজেকে নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করি।

ঠিক তা নয়। মানে—

বীরেশ্বরের কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

রণবীর রিসিভার তুলে নিলেন. হ্যালো—

.. ...

কি বলছেন ওঁরা ?

.....

আমরা আছি চারটে পর্যন্ত—ওঁদের আসতে বল।

রণবীর রিসিভার নামিয়ে রেখে বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, লালবাজার থেকে জানিয়েছে, ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

আসুক।

ওদিকে—

হৃদয় ভৌমিক বিমর্ষ ভাবে নিজের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মনের অবস্থা ভাল না থাকার প্রধান কারণ হল, তিনি আঁচ পেয়েছেন কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়। যে কোন মুহূর্তে বন্ধও হয়ে যেতে পারে। কাজেই ভৌমিক চিন্তিত। এই বয়সে নতুন একটা চাকরি পাওয়া কি সোজা কথা ?

ভৌমিকদা—

একজনের ডাকে চটকা ভাঙল হৃদয় ভৌমিকের। তিনি মুখ

তুলে দেখলেন রণেন গুপ্ত চেয়ার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মাস ছয়েক হল এখানে এসেছে কলম পিষতে। ছোকরার দোষ একটাই, বড় বেশি কথা বলে।

কিছু বলবে ?

অপারেটারের মুখে শুনলাম, লালবাজার থেকে লোক আসছে।

আসুক না। আমার কি ?

দ্রুত গলায় রণেন বলল, কি বলছেন ভৌমিকদা! আপনাকে কি রকম জেরার মুখে পড়তে হবে, বুঝতে পারছেন না।

আমাকে ! আমাকে কেন ?

অবাক কাণ্ড! আপনিই তো সেদিন এসে বললেন, গ্লোবের পাশের গলিটায় পামেলা দত্তকে ঢুকতে দেখে—আপনি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে যাবার মুখেই আপনার মাথায় কে মেরেছিল।

তাতে হয়েছেটা কি ?

পামেলাকে পুলিশ খুঁজছে। আপনার গল্পটা চালু হয়ে যাওয়ায় সকলে বলাবলি করছে, আপনিই নাকি তাকে শেষবারের মত দেখেছেন। তাই—

ভৌমিক এবার ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়লেন।

তাই তো। তবে আশার কথা, পুলিশ এত সব জানে না। রণেন, তুমি যেন আবার উজিয়ে গিয়ে কিছু বলতে যেও না। মিছিমিছি একটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকে-দের আমি একেবারে বিশ্বাস করি না।

আমি না হয় চুপ করে থাকলাম। তাই বলে জানাজানি হতে কি আর বাকি থাকবে? গল্পটা তো আপনি অফিসের অনেকের কাছেই করেছেন। বলছিলাম—

রণেন কথা শেষ না করেই থামল।

রণেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভৌমিক দেখলেন, সুপ্রিয়া অরিন্দমের ঘরে ঢুকছে।

এরা বেশ আছে, কি বলেন ভৌমিকদা ?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভৌমিক বললেন, ভগবান করুন, পুলিশ ওদের জেরায় জেরায় নাজেহাল করে তুলুক।

ঠিক এই সময় সামন্ত প্রবেশ করলেন। সঙ্গে বাসব। দরোয়ান আগেই ছুটেছিল কর্তাদের খবর দিতে। বীরেশ্বর আর রণবীর বেরিয়ে এলেন অফিস ঘর থেকে। সৌজন্যের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

সামন্ত নিজের পরিচয় দেবার পর বাসবের সঙ্গে দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, লোকাল থানার অফিসার কয়েকবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করেছেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা থেপ্টের ব্যাপারে। কেসটা এখন লালবাজারের হাতে। শুধু টাকা হাতানো নয়, একটা খুনের ব্যাপারেও আপনাদের পামেলা দত্ত জড়িয়ে পড়েছেন অনুমান করা যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন পরিস্থিতি এখন জটিল।

সেন বা বিশ্বাস কেউ কিছু বললেন না।

সামন্ত আবার বললেন, আপনাদের কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করতে এলাম। সোমেন গুহর হত্যাকাণ্ড আমাদের লক্ষ্য, নিশ্চয় অনুমান করছেন। লোকটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ছিল। ভাল কথা, এই কেসে মিস্টার ব্যানার্জি আপনাদের সঙ্গে আছেন।

মিস্টার ব্যানার্জি একজন বিখ্যাত মানুষ,—রণবীর বললেন, উনি আজ আমাদের এখানে এসেছেন, ভাগ্যের কথা বলতে হবে। সিগারেট—

বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলেন।

সামন্ত নিলেন একটা।

বাসব মৃদু হেসে বলল, ধন্যবাদ। আমি পাইপ ব্যবহার করি। আপনাদের মত ব্যস্ত ব্যবসায়ী যে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত, জেনে ভারি ভাল লাগল! এবার কাজের কথায় আসা যাক। সোমেন গুহকে আপনারা কতদিন থেকে চিনতেন ?

বছর চারেক হবে। বীরেশ্বর বললেন, হুঁদে দালাল হিসাবে তার নাম ছিল। একদিন নিজে থেকেই এসেছিল আমাদের কাছে।

গুহর সঙ্গে পামেলা দত্তর কোন যোগাযোগ ছিল কিনা জানেন ?

কোম্পানির দুই কর্তা মাথা নাড়লেন।

অর্থাৎ জানেন না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা যদি টাকাটা ফিরে পান, পামেলাকে ক্ষমা করবেন, না পুলিশের হাতে তুলে দেবেন ?

রণবীর বললেন, লোভে পড়ে মেয়েটা এই কাণ্ড বাঁধিয়েছে। টাকা ফেরৎ পেলে আমরা আর কোন ঝামেলার মধ্যে যাব না। তুমি কি বল বীরেশ্বর ?

ঠিক তাই। লালবাজারের একজন বড়কর্তা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। টাকা পেয়ে গেলে, পামেলাকে জেলে পাঠাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

বাসব মৃদু হেসে বলল, ব্যাপারটা এখন বেশ জটিল আকার নিয়েছে টাকাটা পামেলার কাছে নেই। কোথায় আছে সেটাই হল প্রশ্ন। আসল কথাটা কি জানেন, সোমেন গুহ যেভাবে খুন হয়েছে, তা দেখে মনে হয় কোন মেয়ের পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। তবে আপনাদের ওই পঁয়ষট্টি হাজার টাকার জন্যই যে এই রক্তারক্তি ঘটনা ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু রহস্যের আবরণেই সমস্ত কিছু মোড়া হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে, আসল ব্যাপারটা কি।

রণবীর বললেন, আপনি যখন মাথা গলিয়েছেন, তখন ভাবনার কিছু নেই। হেস্তনেস্ত তাড়াতাড়িই হবে।

এত আশাবাদী হবেন না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাল কথা, গুহর ঠিকানাটা কি ?

শোভাবাজারে থাকত জানি। সঠিক ঠিকানা আপনাকে মুখার্জি— আই মিন আমাদের ম্যানেজার অরিন্দম মুখার্জি দিতে পারবে।

ঠিক আছে। ঠিকানাটা আমি ওঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেব।

এখন দু-একটা প্রশ্নের আরো উত্তর দিন। গুহ কি আপনাদের কাছে খুব লাভজনক ছিল।

রণবীর ম্লান হাসলেন।

আগে তাই ছিল। তবে—

আপনাকে পরিষ্কার করে বলাই ভাল,—বীরেশ্বর বললেন, গুহর প্রথম দিকের কাজকর্মে আমরা খুশি ছিলাম, তাকে বিশ্বাস করতাম। সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিরকম ?

মাল পাওয়া যাবে বলে এমন সমস্ত কোম্পানিতে টাকা অ্যাডভান্স করিয়ে দিয়েছে, যার কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা এ সমস্ত জানতে পেরেছি, সে মারা যাবার পর।

তবে তো আপনাদের—

অবস্থা শোচনীয়। এত টাকার লোকসান সয়ে যাবার মত কোমরের জোর আমাদের নেই।

বোঝা যাচ্ছে, সমস্ত টাকাটাই সোমেন গুহ পকেটস্থ করেছিল। আপনাদের মত ব্যবসাদারও যখন ঘোল খেয়েছে, তখন মানতেই হবে লোকটা অসম্ভব চতুর ছিল। মাঝ থেকে আপনারা বিপাকে পড়ে গেলেন। নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা দুঃখের। যা হোক, এবার আমি আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি।

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

রণবীর বললেন, চলুন, আপনাকে মুখার্জির ঘরে নিয়ে যাই।

তার দরকার হবে না। মিস্টার সামন্ত আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন। মনে হয় ওঁর আরো কিছু প্রশ্ন আছে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই একজন বেয়ারাকে দেখতে পেল। সে সসম্ভ্রমে অরিন্দমের ঘর দেখিয়ে দিল।

অরিন্দম একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করতে দেখে অবাক

হল না। কারণ সে জানে, লালবাজারের একজন হোমরা-চোমরা এই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছেন।

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, কয়েক মিনিট আপনাকে বিরক্ত করব।

সে কি কথা। আমি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নই। আপনার যে কোন প্রশ্নের উত্তর আমি সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করব।

ধন্যবাদ। সোমেন গুহর সঙ্গে আপনার কি রকম আলাপ ছিল?

অরিন্দম বলল, মোটামুটি। কর্তাদের কাছেই ওঁর যাতায়াত ছিল। আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথা হয়েছে।

গুহ এখানে প্রথমে এল কিভাবে? কেউ কি—

না। নিজেই একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিল। কথাবার্তা গুছিয়ে বলতে পারত—দালালদের ওটা একটা কোয়ালিফিকেশন। কর্তাদের হাত করতে খুব বেশি সময় লাগে নি।

হুঁ। ওঁর ঠিকানাটা আপনার কাছে আছে শুনলাম!

টেবিলের ওপর অ্যাড্রেস-বুক রাখা ছিল। পাতা উল্টে গুহর ঠিকানাটা বার করে অরিন্দম বলল, এই যে—

বাসব ঠিকানাটা টুকে নিয়ে পকেটে রাখল।

গুহর কোন আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ বোধ হয় দিতে পারবেন না?

আমি কেন, কর্তারাও বলতে পারবেন না। লোকটার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। জানার প্রয়োজনটাই বা কি বলুন না? কাজ নিয়ে কথা। কাজ মিটে গেল—হয়ে গেল।

তা বটে। ও প্রসঙ্গ তাহলে থাক। এখন ভেবে চিন্তে এমন কিছু বলুন তো যাতে আমার কাজে কিছু সুবিধা হয়।

মৃদু হেসে অরিন্দম বলল, আমি তেমন কিছু জানি বলে তো মনে হয় না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে বলল, গোয়ানিজ হোটেল খুন আর এই অফিসের টাকা চুরি একই সুতোয় বাঁধা আমরা ধরে নিয়েছি। এই

ধারণার ভিত্তি কি—সে আলোচনা এখন না করলেও চলবে। সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনার ব্যাপারটা পামেলা দত্তর আগে থেকে জানার কথা নয়—মিস্টার সেন যে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, এটাও আকস্মিক ঘটনা—আপনার কি মনে হয়, অতি দ্রুত পরিকল্পনাটা ছকে নিয়েছিলেন মিস দত্ত?

পামেলাকে এত সাহসী মেয়ে বলে আমার কখনও মনে হয় নি। তবে অনেক টাকা বা দামি জিনিষপত্রের প্রতি তার লোভ ছিল।

কিভাবে বুঝলেন? এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোনদিন তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল নাকি?

ঠিক এই টপিকস নিয়ে কথাবার্তা হয় নি, —থেমে থেমে অরিন্দম বলল, একসঙ্গে কাজ করি। নানা বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কথায় কথায় আসল মনোভাব কখনো-সখনো বেরিয়ে পড়েছে আর কি।

বুঝলাম। একটা প্রশ্ন কিন্তু এই সঙ্গে দেখা দিচ্ছে। মহিলার এই ধরনের মনোভাবের কথা আরো অনেকের তাহলে জানার কথা?

অসম্ভব কিছু নয়।

বাসব একটু থেমে বলল, এই কোম্পানির অবস্থা ভাল নয় শুনলাম। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভেবেছেন?

আমিও তাই শুনছি। অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখছি। মনে হয় হয়ে যাবে।—তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, টাকা-চুরি বা সোমেন গুহর খুন হওয়ার সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন সম্পর্ক আছে নাকি?

না, না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। পরিচিতদের মধ্যে আপনিই বোধ হয় সেদিন মিস দত্তকে শেষবার লিণ্ডসে স্ট্রীটে দেখেছিলেন, তাই না?

যতদূর জানি, তার পরও একজন দেখেছিল।

তাই নাকি! কে সে?

আমাদের ক্যাশিয়ার হৃদয় ভৌমিক। মিস দত্তকে গ্লোবের পার্শের গলিটায় ঢুকতে দেখে তিনি কিছুটা অবাক হয়েই পিছু নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেন নি। পিছন থেকে কে তাঁর মাথায় মারায়···

বলেন কি!—বাসব বিলক্ষণ অবাক হল : ব্যাপারটা ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। এখন পাওয়া যাবে ভদ্রলোককে ?

হ্যাঁ। অফিসেই আছেন।

দয়া করে তাঁকে ডাকুন একবার।

অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুয়েক পরে ঘরে এলেন হৃদয় ভৌমিক। অরিন্দম আসে নি। সে জানে এ সময় তার ওখানে উপস্থিত থাকাটা ঠিক হবে না। ভৌমিকের মুখ থমথমে। কিন্তু মনের মধ্যে অজানা ভয় পাক খেয়ে চলেছে, কেন যে বাহাদুরি দেখিয়ে সকলকে ঘটনাটা বলেছিলেন, এ অনুশোচনা তো রয়েছেই।

বাসব বলল, বসুন। আমার পরিচয় নিশ্চয় পেয়েছেন। কয়েকটা প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর পেলে ভাল হয়।

ভৌমিক বসলেন না : বললেন, বলুন ?

সেদিন পামেলা দত্তর হঠাৎ পিছু নিলেন কেন ?

পিছু ঠিক নিই নি। উনি পার্কসার্কাসের দিকে থাকেন জানতাম। সেদিন ব্যস্তভাবে নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে যেতে দেখে আগ্রহ হল, আমি পিছু পিছু চললাম কোথায় যাচ্ছেন দেখার জন্য।

আপনি গ্লোব সিনেমার পাশের গলিটায় পৌছলেন। এবার গুছিয়ে বলুন তো, কি ঘটেছিল তারপর ?

ভৌমিক বললেন ঘটনাটা।

পড়ে যাবার সময় আপনি কাউকে দেখতে পান নি বলছেন ? কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন ?

অজ্ঞান নয়। মূর্ছা বলতে পারেন। কয়েক মিনিট। একজন

পথচারির সাহায্যে আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মাথায় তখন দারুণ যন্ত্রণা। অগত্যা একটা ট্যাক্সি করে বাসায় ফিরতে হল।

পামেলা দত্ত সম্পর্কে আপনি কি বলতে পারেন? যেমন ধরুন, তার স্বভাব বা ওই ধরনের কিছু?

একটু ছোঁকছোঁকে ধরনের ছিল। টাকা-পয়সা সম্পর্কে বেশ সজাগ। একটু লোভীই বলা চলে। কোয়ালিফিকেশন একটাই, চেহারাখানা খাসা।

লোভী যে ছিলেন মহিলা, আপনি কিভাবে বুঝলেন?

অফিসের ক্যাশ হ্যাণ্ডল করি আমি। মাইনেপত্র আমাকেই দিতে হয় সকলকে। কে কেমন এটুকু বুঝতে পারব না!

হুঁ। আজ তবে এই পর্যন্ত। পরে আবার হয়তো আমাদের মধ্যে কথা হবে। এখন আপনি কাজে যেতে পারেন।

হৃদয় ভৌমিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আর এক মিনিট দাঁড়ালেন না ওখানে। বাসবও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওকে তখন কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে সামন্ত সিগারেট টানছিলেন। কর্তাদের জেরা একমাত্র তিনি শেষ করেছেন।

আপনার হল?

একরকম।—বাসব অন্যমনস্ক ভাবে বলল, চলুন, যাওয়া যাক।

বাইরে এসে জীপে বসতে বসতে সামন্ত বললেন, খুব ভাবনায় পড়ে গেছেন দেখছি।

ঠিকই ধরেছেন। একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি। ভাল কথা, সোমেন গুহর পকেটে কি কি পাওয়া গেছে বলুন তো?

যতদূর মনে পড়ছে, রুমাল, লাইটার, সিগারেটের প্যাকেট, মানিব্যাগ, গোটাচারেক চাবিসমেত রিং—ওই ধরনের আরো কিছু। চলুন না, গিয়ে দেখে নেবেন।

চিঠি বা ওই জাতীয় কিছু ছিল কি?

না।

গোয়ানিজ হোটেলের দুটো ঘরই নিশ্চয় ডাস্ট করান হয়েছে। প্রতিটি ফিঙ্গারপ্রিন্টের এক এক কপি পেলে ভাল হয়।

এ আর এমন কি। কালই পেয়ে যাবেন। কি রকম বুঝছেন ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, এই প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া ঠিক হবে না। কিছু করণীয় আছে। ভাবতেও হবে প্রচুর। তবে এটুকু বলতে পারি, জব্বর একটা সূত্র হাতে এসেছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওতেই কাজ হবে।

সামন্ত আর কিছু বললেন না। স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দিয়ে বাঁক নিলেন।

বেলা তিনটের সময় বাসবকে শোভাবাজারের একটি বাড়ির সামনে দেখা গেল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈরি বাড়িটির যে বহুদিন সংস্কার হয় নি, তা এক নজরেই বুঝতে পারা যায়। এখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরাই ঘরে ঘরে সংসাব পেতে বাস করছেন। দোতলা। ডান ধার দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে।

বাসব ভ্রূ কুঁচকে মিনিট দুয়েক চিন্তা করল। এই বাড়ির কোন ঘরে সোমেন গুহ বাস করত প্রথমে জানা দরকার। ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পুরুষরা কাজকর্মে বেরিয়েছে, মেয়েরা নিজের ঘরে আছে। এটাই স্বাভাবিক। এই সময় দমকা কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। কাশতে কাশতে এক বৃদ্ধ নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, সোমেন গুহর ঘর কোনটা বলতে পারেন ?

মুখ লাল করে কোন রকমে কাশি চাপলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, সোমেন গুহ! সাতজন্মে নাম শুনি নি।

তিনি এ বাড়িতে থাকেন। মানে—

থাকেন তো আমি কি করব? খুঁজে নিন। যত ঝামেলা—

কাশতে কাশতে বৃদ্ধ রাস্তায় নামলেন। বিচিত্র বিকারে ভুগতে থাকে এই ধরনের কিছু লোক। বাসব অন্য কোন ভাবে সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, এই আশায় বারান্দায় উঠে পড়ল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কয়েক পা এগোতেই চোখে পড়ল সিঁড়ির তলাকার ঘরের দরজায় 'এস গুহ' লেখা প্লেট আঁটা রয়েছে।

লালবাজার থেকে চাবির তোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তালা খুলতে বিশেষ অসুবিধা হল না। ভেতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করল। বাসব দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। চারধার অন্ধকারে ডুবে গেল। দেশলাই জালবার পর সুইচবোর্ড খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। হালকা পাওয়ারের বালব্ জ্বলে ওঠবার পর চারধার ভাল করে দেখা সম্ভব হল।

আসবাব বলতে একটা চৌকি আর দু'খানা চেয়ার ছাড়া আব কিছু নেই। বেশ কয়েকটা হুইস্কির বোতল যেমন তেমন ভাবে পড়ে রয়েছে তাকের ওপর। কিছু জামা-কাপড় ইতস্তত ছড়ান। চা শুকিয়ে থাকা কাপ মেঝেব উল্টে পড়ে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভারি অপরিষ্কার লোক ছিল সোমেন গুহ।

বাসব চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঝুঁকে চৌকির তলাটা দেখল। বেশ বড় আকারের পুরোন একটা সুটকেশ রাখা রয়েছে। টেনে বার করে বাইরে রাখল বাসব। খুঁটিয়ে দেখতে সুবিধা হবে।

চটকদার কিছু জামা-কাপড় ছাড়া, টুকিটাকি আরো অনেক কিছু রয়েছে। রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো চিঠির তাড়াটা বাসব তুলে নিল। প্রতিটি চিঠি একই জনের লেখা—পাটনার বাসুদেব দত্ত। মনে হয় বাসুদেব সোমেন গুহর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন। প্রতিটি চিঠি পড়তে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। বাসব তাড়াটা পকেটস্থ করল।

নীল রঙের মলাট দেওয়া একটা হিসাবের খাতা রয়েছে। সাধারণ ভাবে হিসাবের খাতা বলতে যা বোঝায়, এটা কিন্তু তা নয়

কবে কত টাকা পাওয়া গেছে লেখা রয়েছে তারিখ অনুসারে, অথচ খরচের ঘর খালি। অর্থাৎ খরচের হিসাব গুহ রাখত না। বাসব পাতা উল্টে যেতে লাগল। এক জায়গায় থামতে হল।

খরচের একটা হিসেব মাস দেড়েক আগেকার তারিখে লেখা রয়েছে এখানে। জনৈক হরিমোহনকে চারশ' টাকা দেওয়া হয়েছে। তলায় মন্তব্য আছে, 'সময় বুঝে বস'য়ের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নিতে হবে'। বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সোমেন গুহর একজন 'বস' ছিল তাহলে। সেই লোকটার জন্য গুহ চারশ' টাকা দিয়ে হরিমোহন নামে কারোর কাছ থেকে কিছু কিনেছিল।

হিসেবের খাতাটা রেখে এবার ব্যাঙ্কের পাশ-বই দুটো তুলে নিল। দুটো মিলিয়ে মোট ষোল হাজার টাকা জমা আছে। গুহর মত লোকের পক্ষে সঞ্চয় ভালই বলতে হবে। পাশবই সবুজ রঙের প্লাস্টিকের ফ্ল্যাপ দিয়ে মোড়া। বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে বাসবের নজরে পড়ল, পাশবইয়ের ফ্ল্যাপের একধারে গোটা কয়েক কাগজের টুকরো মোড়া অবস্থায় গোঁজা রয়েছে।

বাসব কাগজগুলো বার করে নিল। চারটে টুকরো। সবগুলোতেই দ্রুত হাতে ইংরাজিতে কারোর না কারোর ঠিকানা লেখা। প্রত্যেকটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। দুটো ঠিকানা হল মাইকা কোম্পানির। বাকি দুটো ব্যক্তি বিশেষের। যেমন—

অভয়কান্তি শীল

১০৩, রজার্স লেন, কলিকাতা-১৬

হরিমোহন বসাক

৭৩, অখিলবন্ধু সেন লেন, কলিকাতা-২৭

বাসব ঠিকানা দুটো টুকে নিল। বিশেষ একটা ঠিকানা যখন হরিমোহন নামক ব্যক্তির। একেই কোন কারণে চারশ' টাকা দিয়েছেন গুহ। পরে বস'য়ের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবার

সম্ভবনা ছিল। বাসব ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল। ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য যেন পাক খেয়ে রয়েছে।

ঠিক এই সময় দরজার বাইরে জুতোর শব্দ হল। বাসব দ্রুত সরে এসে আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইরে এসে নিশ্চয় কেউ দাঁড়িয়েছে। ওর ধারণাই ঠিক। দরজায় চাপ দিল কেউ। তারপরই মৃদু কথাবার্তার শব্দ। একজন নয়, অন্তত দু'জন লোক এসেছে। বাসব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দরজার খিল খুলে দিল। ঘর অন্ধকারে ভরে রয়েছে। আগন্তুকদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় আবার চাপ দিয়েছিল, দরজা খুলে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার! প্রথমে ঠেললাম খুলল না। অথচ এবার এক ঠেলাতেই পাল্লা সরে গেল!

দ্বিতীয় জন বলল, আপনার মনেব ভুল। দরজাটা ভেজানই আছে। প্রথমবার তেমন জোবে চাপ দেন নি বলে খোলে নি।

হতে পারে। তবে দরজায় একটা তালা থাকাব কথা। সেটা এখন নেই। এর কি উত্তর আছে তোমাব কাছে:

আমার মনে হয়, কেউ ঢুকেছিল ঘরে।

হতে পারে। তবে—

হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

হাসি মুখে বাসব এগিয়ে আসতে আসতে বলল, আপনাদের অনুমান ঠিক। আমি আছি ঘরে। কিন্তু আপনি—আপনি এখানে?

বীরেশ্বর বিশ্বাস থতমত খেলেন। বাসবকে তিনি এখানে আশা করতে পারেন নি। কাঁপা গলায় বললে বিশ্বাস করবেন না। আমিও গোয়েন্দাগিরি করছি আপনার মত। গুহর ঘরটা একটু পরীক্ষা করতে এসেছিলাম।

আপনার কথাটা একটু ইয়ে ধরনের হয়ে গেল। যা হোক। আপনার সঙ্গীটি মনে হচ্ছে সরে পড়লেন।

শীল! তাই নাকি?

বীরেশ্বর পিছনে ফিরে দেখলেন, সত্যি তাঁর সঙ্গী উধাও হয়ে গেছে। বিমর্ষ হাসি দেখা দিল তাঁর মুখে।

বাসব প্রশ্ন করল, লোকটি কে?

আপনি চিনবেন না। আমাদের লাইনের লোক।

নামটা জানতে পারি কি?

অভয়কান্তি শীল।

নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ও কথা থাক। মিস্টার বিশ্বাস, আমি আপনার কৈফিয়তে কিন্তু খুশি হতে পারলাম না। অনুগ্রহ করে আসল কথাটা বলবেন কি? পরিষ্কার কথাবার্তা তদন্তের পক্ষে সুবিধাজনক, নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

বীরেশ্বর বিন্দুমাত্র সংকুচিত না হয়ে বললেন, আপনাকে যা বলেছি, তা ছাড়া এখানে আসার আর কোন কৈফিয়ৎ আমার কাছে নেই। এখন কথাটা বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অনুগ্রহ করে বলুন, পুলিশ থাকতে, আমি থাকতে, আপনি আবার কেন গোয়েন্দাগিরিতে নামলেন?

এর উত্তর দিতেই হবে?

দিলে ভাল হয়।

ম্লান হাসলেন বীরেশ্বর। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বললেন, আজ আমায় ক্ষমা করুন মিস্টার ব্যানার্জি। তেমন দিন এলে নিশ্চয় বলব। যা দেখবার, আপনি এ ঘরে দেখে নিয়েছেন। সূত্রটুত্র এখন আপনার হাতে। আমি আর পরিশ্রম করি কেন? চলি।

উনি কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাসব প্রায় এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল। ওকে এখনই একবার চৌরঙ্গী পৌঁছুতে হবে। ঠিকানা পকেটেই রয়েছে। অভয় শীলের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

রজার্স লেনের একশ তিন নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছুতে আধ

ঘণ্টার বেশি সময় লাগল না। হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। এক নজরেই বুঝতে পারা যায়, এই শতকের প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল। রং-ওঠা দরজার সামনে একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। বাড়ির চাকর হবে বোধ হয়।

অভয়বাবু বাড়ি আছেন?

বিড়ি ফেলে দিয়ে ছোকরা পাল্টা প্রশ্ন করল, কোথা থেকে আসছেন?

আমি এই অঞ্চলেরই লোক। মনে হচ্ছে, উনি বাড়িতেই আছেন। আমার কার্ডটা ওঁকে গিয়ে দেখাও।

বাসবের হাত থেকে কার্ড নিয়ে ছোকরা চলে গেল।

ফিরে এল আবার মিনিট কয়েক পরে। বাসবকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা ঘরে। মোটামুটি সাজান ঘরখানা। গৃহকর্তা দেখা দিলেন। বয়স্ক লোক। গোলগাল চেহারা। ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে। বিরক্ত হয়েছেন মনে হয়।

বাসব ভূমিকা না করেই বলল, আপনি বিরক্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি উপায়হীন। আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে, আমি লালবাজার থেকে একজন পদস্থ কর্মচারিকে এখানে আনিয়ে নিতে বাধ্য হব।

একি জুলুম—, মিহি গলায় অভয় শীল বললেন, কোন দোষ করলাম না, আর ওপর-পড়া হয়ে আপনি এখানে এসে উপস্থিত হলেন।

সোমেন গুহর ঘর থেকে কিছুক্ষণ আগে আপনি পালিয়ে এসেছেন?

আ-আমি—

হ্যাঁ। বীরেশ্বরবাবু আমাকে বলেছেন সেকথা। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সন্দেহজনকে। পুলিশে আমি খবর দিতে চাই না। আপনি শুধু নিজের মন খোলসা করুন।

একটু চুপ করে থাকার পর অভয় শীল বললেন, আমি সোমেন গুহর ঘরে যেতে চাইনি। বীরেশ্বরবাবু আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। তখনই মনে হয়েছিল একটা ঝামেলা বাধবে। যাক, কি শুনতে চান বলুন?

গুহ খুন হয়েছে, আপনার অজানা থাকার কথা নয়। মৃত লোক-টার সম্পর্কে আমার প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। তার সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার কি পেশা, আপনার বোধ হয় জানা নেই। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মাইকার ব্যবসার সঙ্গে আমি নানা ভাবে যুক্ত। ভগবানের দয়ায় রোজগারও করেছি প্রচুর। বছর পাঁচেক আগে সোমেন এল কাজের আশায়। লোকটাকে আমার খারাপ লাগল না। রেখে দিলাম। বছর তিনেক ভাল ভাবেই রইল। তারপর ঘটল অঘটন।

অঘটন!

হ্যাঁ। চুরি করে ধরা পড়ল আর কি। বরখাস্ত করলাম। পরে শুনেছিলাম, অভ্রের বাজারেই দালালি করে পেট চালাচ্ছে। হঠাৎ, মাসখানেক আগে কানে এল, সোমেনের সঙ্গে আজকাল বীরেশ্বর বিশ্বাসদের ঘনিষ্ঠতা চলেছে। স্থির করলাম ওঁদের সাবধান করে দিতে হবে। কিন্তু আজ নয়, কাল নয়, করতে করতেই শুনলাম সোমেন খুন হয়ে গেছে।

বীরেশ্বর বিশ্বাসকে আপনি তাহলে অনেকদিন থেকেই চেনেন?

বিশ্বাস কেন, রণবীর সেনের সঙ্গেও আমার অনেক দিনের আলাপ।

হরিমোহন বসাক নামে কাউকে চেনেন?

না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এবার বলুন তো, গুহর ঘরে আপনারা চড়াও হলেন কেন?

অভয় শীল মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, পাগলামী মশাই—

সাদা কথায় যাকে বলে পাগলামী। বিশ্বাস আমাকে এসে বলল, সোমেনের খুন সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে সন্দেহ ওর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেমেনের ঘরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করলে, ভাল কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

আপনাকে এসে অনুরোধ করার অর্থ ?

আমি সোমেনের আস্তানার ঠিকানা জানি নে। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু যেতে চাই নি। একরকম ধরে-বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ওঁদের অফিসের পামেলা দত্তকে চেনেন ?

বারকয়েক দেখেছি।

গুহর সঙ্গে পামেলার কোন যোগাযোগ ছিল কিনা বলতে পারেন ?

না, মশাই। কার সঙ্গে কার যোগাযোগ আছে, এ সমস্ত দেখে বেড়াবার সময় আমার নেই।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত অভয়বাবু। আর একটা প্রশ্ন—

বলুন ?

লোকটা কেন খুন হল বলতে পারেন ? কিম্বা এমন কাউকে আপনার সন্দেহ হয়, যে এই বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটিয়েছে ?

অভয় শীল বেজার মুখে বললেন, আপনার প্রশ্নগুলো মশাই অত্যন্ত জট পাকানো। আমি কি করে বলব ? সোমেনের ইদানীংকার কিছু কি আমি জানতাম ? এইটুকু বলতে পারি, লোকটা ভাল ছিল না। তার শত্রুর অভাব থাকার কথা নয়।

বাসব ওখান থেকে বিদায় নিল।

কিছুটা বিমর্ষ ভাবেই ফিরে এল বাড়িতে। আশানুরূপ কাজ এগোচ্ছে না। অথচ এর চেয়ে অনেক জটিল কেস হেলায় সম্পন্ন হয়েছে অতীতে। তবে এটা ঠিক, প্রধান সূত্র কাছাকাছিই আছে, সতর্কতার অভাবে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে এই যা।

ড্রইংরুমে শৈবাল বসে ছিল। একখানা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। পত্রিকা মুড়ে রেখে বলল, কোথায় থাক আজকাল? গতকালও এসেছিলাম। দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর চলে যেতে হল।

বাসব বসতে বসতে বলল, বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি ডাক্তার।

বুঝলাম না।

পুরন্দর সামন্ত একটা কেস আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। খুব যে একটা জটিল ব্যাপার, তা নয়। তবু থৈ পাচ্ছি না।

কেসটা কি?

বলব তোমাকে। তবে তার আগে গলায় কিছু ঢালা যাক। নেপাল নন্দনের উদ্দেশে একটা হাঁক ছাড়তে হচ্ছে।

ডাকতেই বাহাদুর এসে উপস্থিত।

দশ মিনিটের মধ্যে কফি এসে গেল।

বাসব এতক্ষণ চুপচাপ মিক্সচার পুড়িয়ে যাচ্ছিল। এবার কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করল। বলা শেষ হল এক সময়। কোন পথ বেয়ে তদন্ত এগোচ্ছে, তা বলতেও ভুলল না।

শৈবাল শুনে গেল একাগ্র মনে।

কোন ফাঁক দেখতে পাচ্ছ, ডাক্তার?

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, ফাঁক-টাকগুলো তো সাধারণত আমার চোখে ধরা পড়ে না। তবে একটা কথা এখন মনে পড়ছে। ভেবে দেখ, পয়েন্টটা ইম্পর্ট্যান্ট কিনা।

বল।

হোটেলে পামেলার ঘরের তোশকের তলা থেকে একটা রিংসমেত চাবি আর ক্যাশমেমো পেয়েছিলে। ও দুটো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া বোধ হয় দরকার। বিশেষে তুমি যখন বিশ্বাস করছ, চাবি আর ক্যাশমেমো হত্যাকারীর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।

ক্যাশমেমোটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। চৌরঙ্গীর একটা

দোকান থেকে ইস্যু হয়েছিল। অবশ্য ওরা ক্রেতার নাম বা চেহারার বিবরণ দিতে পারল না। চালু দোকান। সব ক্রেতাকে মনে রাখা সম্ভবপরও নয়।

বাসব কথা শেষ করেই পাশের ঘরে চলে গেল। আলমারি খোলার শব্দ পেল শৈবাল। ও ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। হাতে সেই চাবি।

চাবিটা দেখে তোমার কি মনে হয়, ডাক্তার?

পেতলের চেপ্টা চাবি। মুখের দিকটা সরু। দুটো দাঁত। ওপর দিকে কোন মার্কা ছিল বোধ হয়, এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আঙুলের চাপ পড়ে পড়ে বা অন্য কোন কারণে ক্ষয়ে এসেছে। শৈবাল চাবিটা উল্টেপাল্টে দেখল।

কি বুঝলে ডাক্তার?

গদরেজ বা ওই ধরনের কোন তালার যে নয়, এ সম্পর্কে নিশ্চিত আমি। ওই সমস্ত তালার চাবিতে দাঁত থাকে অন্য ধরনের।

তাই তো!

বাসব দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

আমি দিন দিন ইডিয়ট হয়ে যাচ্ছি ডাক্তার। এই সহজ কথাটা বুঝতে আমার এত সময় লাগল। তুমি ঠিকই বলেছ, এটা কোন তালার হতে পারে না। এটা—

মোটরের চাবি।

ঠিক তাই। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, হত্যাকারী গুহকে খুন করার পর টাকাটা খুঁজতে আরম্ভ করল। মনে রাখতে হবে, তখন পামেলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তোশকটা উল্টে দেখার সময় তার পকেট থেকে চাবি আর ক্যাশমেমোটা পড়ে যায়। অবশ্য সে শেষ পর্যন্ত টাকাটা পেয়ে যায় খাটের তলা থেকে। এইবার আমাদের সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

শৈবাল বলল, তুমি তো আগেই বুঝতে পেরেছ, সকালে পামেলা

বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই হত্যাকারী হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। দরোয়ান তাকে বাধা দেয় নি। কারণ সে ভেবেছিল হোটেলের কোন বোর্ডার।

বাসব শৈবালের কথার খেই ধরল, পকেটে যখন গাড়ির চাবি ছিল, তখন আশা করা যায়, আগের সন্ধ্যায় হত্যাকারী হোটেলের কাছাকাছি কোথাও গাড়িটা দাঁড় করিয়েই ভেতরে ঢুকেছিল। তাই যদি হয়, তবে পরের দিন সকালে হত্যাকারীকে নিশ্চিত ভাবে বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। নিজের গাড়ির সামনে এসে, পকেট হাতড়েই বুঝতে পেরেছে চাবি নেই। এবার বল ডাক্তার, এরপর তার পক্ষে কি করা সম্ভব?

চাবি না পেয়ে নিশ্চয় সে ঘাবড়েছে। কিন্তু তখন ফিরে গিয়ে চাবি খুঁজে আনা সম্ভব নয়। বিরাট রিস্কের ব্যাপার। অথচ চাবি ছাড়া গাড়ি চালান সম্ভব নয়। তখন তার সামনে একটা রাস্তাই খোলা ছিল। ট্যাক্সিতে চেপে কোন মোটর গ্যারাজে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। তাড়াতাড়ি তাদের সাহায্যে গাড়িটা ওখান থেকে সরিয়ে আনা বা ডুপ্লিকেট চাবি সংগ্রহ করা।

চমৎকার বলেছ ডাক্তার। আমার ধারণা, ব্যাপারটা এইভাবেই গড়িয়েছে। এমন খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, চাবিটা কোন ধরনের গাড়ির। তারপর এক এক করে ঢুঁ মারতে হবে মধ্য কলকাতার সমস্ত গ্যারাজগুলোতে।

মধ্য কলকাতায় কেন? সে শ্যামবাজারের কোন গ্যারাজের সাহায্য নিয়ে থাকতে পারে।

কথাটা একটু ইয়ে ধরনের হয়ে গেল তোমার। সে এতদূর যাবে কেন? তার হাতে সময় কম। আশপাশের কোন গ্যারাজের সাহায্য নিয়েছে, এটাই স্বাভাবিক। কাল যা হোক করা যাবে। এখন ওঠা যাক।

কোথাও বেরোবে?

হ্যাঁ। তুমিও যাচ্ছ, আমার সঙ্গে?

কোথায়?

হরিমোহন বসাকের সন্ধানে। লোকটা হয়তো কোন কাজে লাগবে না। তবু তার খোঁজ করা দরকার। গুহ যত্নে কোন ঠিকানা লিখে রেখেছিল বলেই আমি তার সম্পর্কে আগ্রহশীল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে পড়ল। চেতলা পৌঁছুতে আর কি অসুবিধা। ঝামেলা দেখা দিল তার পর। অখিলবন্ধু সেন লেন আর পাওয়া যায় না। ওল্ডস মোবাইলকে বড় রাস্তার ওপর রেখে দু'জনে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল। আধ ঘণ্টাটাক চেষ্টার পর পাওয়া গেল।

সরু গলি। নামে লেন হবে, আসলে এটা বাই-লেনেরও অধম। নম্বর দেখতে দেখতে আসল জায়গায় এসে দাঁড়াল শেষে। হাড় জিরজিরে একতলা বাড়ি।

বাসব বারকয়েক কড়া নাড়ল।

গলা খাঁকারির শব্দ এল কয়েকবার। তারপর দরজা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। বাড়ির মতই তাঁর চেহারা।

কাকে চাই?

হরিমোহন বাবু আছেন?

আগন্তুকদের ভদ্র চেহারা বৃদ্ধকে সচকিত করেছিল।

নেই। আমার হয়েছে যত জ্বালা। রাজ্যের পাওনাদার আসছে! ওদিকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি থাকা হবে না বাবুর।

এখন তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?

মানিক ঘোষের ভাঁটিখানায় পেতে পারেন। জায়গাটা কোথায় জানেন তো? পুলিশ ব্যারাক ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই বলে দেবে।

বাসব আর কথা না বাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে পা চালাল।

গাড়ীতে এসে বসার পর বাসব বলল, বুড়ো লোকটা কিন্তু একটা

কথা জব্বর বলেছে। রাজ্যের খদ্দের আসছে। এর মানে একটাই। হরিমোহন কিছু একটা বিক্রি করে।

জিনিসটা কি বল তো?

সোমেন গুহও নিজের ডায়রিতে লিখে রেখেছে, হরিমোহনকে চারশ' টাকা দিয়ে কিছু একটা কিনেছে। টাকাটা পরে বস'য়ের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। আমার মনে হচ্ছে, জিনিসটা এমন কিছু যা বাজারে সহজলভ্য নয়।

কি হতে পারে?

হরিমোহনের খোঁজ পেলে হয়তো বোঝা যাবে।

ওয়াটগঞ্জ পৌছবার পর, বৃদ্ধের কথামত একটু খোঁজ-খবর নিতেই মানিক ঘোষের ভাঁটিখানার সন্ধান পাওয়া গেল। দিশী মদের দোকান সচরাচর যেমন হয়, তেমন নয়। চেয়ার টেবিল পাতা—নিয়ন আলো জ্বলছে। বহুলোক গুলতানি মারতে মারতে মা-কালী মার্কা বোতল নিয়ে ব্যস্ত।

ওরা ঢুকল ভেতরে।

সচকিত হয়ে চোখ তুলল অনেকেই। এমন ভদ্র চেহারার খদ্দের এখানে বড় একটা দেখা যায় না। হলের এক প্রান্তে ছোট একটা কাউন্টার। নির্বিকার মুখে ওখানে একজন লোক টাকা গুণে চলেছে। তার চেহারা বেশ বড়সড়। রং কুচকুচে কালো।

বাসব সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলল।

বলুন, আজ্ঞে—

আপনি কি এই বার'য়ের মালিক?

আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন।

একটু সহযোগিতা চাইছিলাম আপনার কাছ থেকে। হরিমোহন বসাক নামে এখানকার একজন নিয়মিত খদ্দের—তিনি কি এসেছেন?

এবার লোকটির চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল।

হরিমোহনকে আপনি চেনেন?

না। পরিচয় করতে এসেছি। একটু দরকার ছিল।

কিছু মনে করবেন না আজ্ঞে, হরিমোহনের সন্ধান দিল কে আপনাকে?

সোমেন গুহ। লোকটা অবশ্য মরে গেছে। ওর কাছেই—

কথাটা শেষ না করেই বাসব হাসল।

আসুন। পিছনের ঘরটায় আসুন।

লোকটি কাউণ্টারের পিছন দিকের একটা ঘরে ওদের নিয়ে গেল। গোটাকতক চেয়ার আর একটা নিচু টেবিল দিয়ে সাজান ঘরখানা। লিকলিকে দেখতে একজন লোক সুরা-সেবায় একাগ্র ছিল। ওদের পায়ের শব্দে তাকাল অবাক হয়ে।

মানিক ঘোষ বলল, এঁরা তোমাকে খুঁজছেন। সোমেনের পরিচিত লোক।

হরিমোহন উঠে দাঁড়াল। অসংলগ্ন ভাবে বলল, আমার সঙ্গে কি দরকার? আমি তো ঠিক—

বাসব বলল সহজ ভাবে, সোমেনের কাছ থেকে সব টাকাটা পেয়েছেন?

টাকা! ও—মানে, শ' দুয়েক টাকা বাকি থেকে গেছে। লোকটা হঠাৎ মরে যাওয়ায় সব গুবলেট হয়ে গেল।

টাকার ব্যবস্থাটা আমি করে দেব। তবে

মানিক ঘোষ বলে উঠল, আপনারা কথা বলুন। আমি গিয়ে খদ্দের সামলাই।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিমোহন বলল, বসুন আপনারা। সোমেন লোকটা খারাপ ছিল না। বাকি টাকাটা দেবেন বলছেন—মালটা তাহলে এখন আপনার হাতে?

বাসব মাথা নেড়ে বলল, না। তাহলে আর আপনার কাছে আসব কেন?

বুঝলাম। ওই দামে কিন্তু আর দিতে পারব না। সোমেন বন্ধু-লোক বলে জলের দরে মালটা ছেড়েছিলাম! তাছাড়া আগেকার মত এখন আর বাংলাদেশ থেকে বস্তা বোঝাই হয়ে আসছে না।

কত বেশি পড়বে? মালটা এখানেই আছে নাকি?

বারোশ' টাকার নিচে দেওয়া যাবে না। এখনই দরকার?

হলে ভাল হত।

একটু ভেবে নিয়ে হরিমোহন বলল, এখানে নেই। ও সমস্ত জিনিস তো যেখানে সেখানে রাখা যায় না। যদি তাড়া থাকে খুব, তবে চলুন। পুরো টাকাটা সঙ্গে আছে তো?

আছে।

তিনজনে মানিক ঘোষের ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে এল। অনেক ক্ষণ থেকে হরিমোহন মাল খাচ্ছিল নিশ্চয়। তার চালচলন দেখে, তা কিন্তু মনে হয় না। গাড়ি পর্যন্ত তিনজনের মধ্যে কোন কথা হল না। শৈবাল বসল পিছনে। সামনের দিকে বাসবের পাশে হরিমোহন।

কোথায় যেতে হবে?

চেতলার দিকে চলুন। তারপর বলে দেব।

এন্ডস মোবাইল গতি নিল।

নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁক না নিয়ে গাড়ি যখন খিদিরপুর ব্রীজের ওপর উঠে পড়েছে, তখন হরিমোহনকে বিশেষ বিচলিত হতে দেখা গেল।

উত্তেজিত ভাবে সে বলল, চেতলার রাস্তা এটা নয়। কোথায় চলেছেন?

ভারি গলায় বলল বাসব, লালবাজার।

তামাসা করার সময় এটা নয়। গাড়ির মুখ ঘোরান।

আপনি গভীর জলের মাছ হলেও, হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছেন হরিমোহন বাবু। চোরাই রিভলবারের আমি ক্রেতা নই।

আমি সোমেন গুহর খুনের তদন্ত করছি। গুহর ডায়রিটা এখন আমার হাতে। আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই জানা হয়ে গেছে।

হরিমোহন এবার ভেঙে পড়ল : বিশ্বাস করুন, খুনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সোমেন আমার কাছ থেকে একটা রিভলবার কিনে ছিল, এই পর্যন্ত। তাছাড়া—

যা বলবার লালবাজারে গিয়ে বলবেন। বলতে যদি না চান, কিভাবে কথা বার করতে হয়, পুলিশ তা ভাল ভাবেই জানে।

হরিমোহন এবার প্রায় কেঁদে ফেলল : বিশ্বাস করুন স্যার, আমি চোরাই মালের কারবার করি ঠিকই, তবে খুন-জখমের মধ্যে কখনও যাইনি। একবার লালবাজারের মধ্যে গিয়ে ঢুকলে, আমার ভবিষ্যতের বারোটা বেজে যাবে।

রেসকোর্স এসে পড়েছিল। বাসব একটা গাছ তলায় গাড়ি থামাল। স্ট্রীট-লাইট জায়গাটাকে বিশেষ আলোকিত করে তুলতে পারে নি। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। জোনাকিরা নিজের মনেই জ্বলছে নিভছে।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁচাবার একটা-মাত্র উপায় আছে।

বলুন স্যার ?

আমাকে সাহায্য করা। আমি পুলিশের লোক নই। বেসরকারি ভাবে তদন্ত করছি। তবে পুলিশের সঙ্গে আমার গভীর যোগাযোগ আছে। বলুন, কি করতে চান এবার ?

ধরা গলায় হরিমোহন বলল, কি ঝামেলায় পড়লাম। খুন-জখম থেকে আমি থাকি একশ' হাত দূরে। ক্রেতা মাল নিয়ে কি-করে, তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। কি সাহায্য যে করব আপনাকে, তাও বুঝতে পারছি না। বলুন, কি বলবেন ?

সোমেন গুহ আপনার কাছ থেকে একটা রিভলবার কিনেছিল ?

হ্যাঁ, স্যার।

কি জন্যে ?

ওই যে বললাম, ক্রেতা মাল নিয়ে গিয়ে কি করে, তা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না।

পাইপে ঘন ঘন কয়েকবার টান দেবার পর বাসব বলল, অস্ত্রটা তাকে আপনি কোথায় বেচেছিলেন ?

জায়গাটা কোথায়, জানতে চাইবেন না, স্যার। প্রত্যেক ব্যবসায় কিছু না কিছু গোপন ব্যাপার থাকে।

সে সময় গুহ একা ছিল, না সঙ্গে আর কেই ছিল ?

গুহ এসেছিল একজন লোকের সঙ্গে গাড়ি চড়ে। মাল নেবার সময় অবশ্য ভেতরে সেই লোক যায় নি। গাড়িতেই ছিল।

লোকটা দেখতে কেমন ?

ভাল করে তো লক্ষ্য করি নি, স্যার। স্যুট পরা, মাঝবয়সী হবে।

পরে দেখলে তাকে চিনতে পারবেন ?

একটু ভেবে হরিমোহন বলল, বলতে পারছি না। ভাল করে দেখি নি তো !

গাড়ির রং কেমন ? ওটা কি মার্ক-টু ?

নীল রঙের গাড়ি। আমার তো মনে হল মার্ক-টু'ই। গাড়িটা দেখলে হয়তো চিনতে পারব, স্যার।

হুঁ। শুনুন হরিমোহন বাবু, আপনাকে আজ আর ছাড়ছি না। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আপনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে।

আটকাবেন !—হরিমোহন ককিয়ে উঠল, পুলিশ আমার দফা-রফা করে দেবে। ওদের সঙ্গে আবার নাটক করব কি ?

আমার কথাটা বুঝতে পারেন নি। পুলিশ কেন আটকাবে ? আপনি থাকবেন আমার কাছে। আমার বাড়িতে। গুহর খুনের ব্যাপারে কাল একটু সাহায্য করতে হবে।

এ তো খুব ভাল কথা স্যার। ঠিকানাটা দিন। কাল কখন আসতে হবে, বলুন ? আমি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সেই সময় পৌঁছে যাব।

বাসব মৃদু হাসল।

তা হয় না হরিমোহন বাবু। এত বড় সুযোগ আমি আপনাকে দিতে পারি না। ছাড়া পেলে আপনার আর দেখা পাওয়া যাবে না। আর কথা নয়। চুপচাপ বসুন।

ওল্ডস মোবাইল সচল হল।

এবার গন্তব্যস্থল হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট।

বাসব ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরল বেলা এগারোটার সময়। তাকে বেশ শ্রান্ত দেখাচ্ছে। এই ক'ঘণ্টায় ধকল কম গেল না। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে, শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল। গতরাত্রে শৈবালের বাড়ি ফেরা হয়নি। কারণ হরিমোহন যাতে সরে পড়তে না পারে, সেদিকে নজর দেবার দায়িত্ব ওর ওপরই ছিল।

পরিস্থিতি হরিমোহনের কাছে সুখকর না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু সে প্রবল আপত্তি বা চেঁচামেচি করতে সাহসী হয়নি। অন্ধকার জগতের জীব। পুলিশকে সমীহ করে চলতেই হয়। এদের কথামত কাজ করলে যদি পুলিশের হাত থেকেই রেহাই পাওয়া যায়, মন্দ কি। রাগ অবশ্য হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানিক ঘোষের ওপর। গাধার অধম। ভাল করে লোক দু'টোকে বিচার না করেই ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

তোমার কয়েদী এমন কি করছে, ডাক্তার?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তো দেখছি ঘুমোচ্ছে।

এত বেলা পর্যন্ত! অবাক কাণ্ড।

রাতের খাওয়াটা বেশ জুতের হয়েছিল তো। তারপর নরম বিছানা। ভাল কথা, এতক্ষণ কি সমস্ত করে এলে?

পুলিশের অসাধ্য কর্ম নেই, জান তো? সামন্তর সহযোগিতায়

সেই গ্যারাজটা খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে। নীল রঙের গাড়িটার নম্বর পেয়েছি। এই সমস্ত করতেই তো এত সময় চলে গেল।

তার মানে হত্যাকারীকে তুমি চিনতে পেরেছ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, পেরেছি। কিন্তু এই পারায় তো আর তার হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরানো যাবে না। চাই প্রমাণ। হরি-মোহনকে এবার এখানে নিয়ে এস। প্রমাণের জন্য এবার ওকে কাজে নামাতে হবে।

হত্যাকারীর নামটা—

বলব ডাক্তার। হরিমোহনকে আগে নিয়ে এস।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেবাল ওকে এনে হাজির করল।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, তারপর হরিমোহন বাবু, কি খবর?

ব্যাজার মুখে হরিমোহন বলল, আপনার কারবার কিছু বুঝছি না, স্যার। মিছিমিছি আমাকে রাতভোর আটকে রাখলেন।

মিছিমিছি কে বললে? এইবার কাজে নামতে হবে না! আমরা তোমাকে একটা বাড়ি চিনিয়ে দেব। আমি যে কথা শিখিয়ে দেব, সেই সমস্ত কথা বাড়ির কর্তাকে গুছিয়ে বলবে।

লোকটা কে?

তুমি তাকে চেন না। সোমেন গুহ যখন রিভলবার কিনতে গিয়েছিল, সেই সময় তুমি তাকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছিল।

বলুন, কি বলতে হবে তাকে।

বেশ স্মার্ট ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করবে। বলবে ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে, নইলে আগেই তুমি এসে উপস্থিত হতে। এখন টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ না করলে, ফোন করে সব কথা পুলিশকে জানিয়ে দেবে।

হরিমোহন আকাশ থেকে পড়ঃ: এ সমস্ত কি বলছেন, স্যার! আমাকে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে যাবে কেন লোকটা?

না করে উপায় কি! তুমি যে বলবে, গুহ যখন রিভলবার কিনতে

গিয়েছিল, গাড়িতে বসে থাকলেও তাকে তুমি ভালভাবেই চিনে রেখেছ। আসল কথাটা কি জান হরিমোহন, ওই রিভলবারের গুলিতে গুহ খুন হয়েছে।

এতক্ষণে স্যার ব্যাপারটা বুঝলাম। এই কাজটা করে দেবার পর আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?

নিশ্চয়। তোমার আমি ভালই করছি বলতে গেলে। এই ফাঁকে কিছু রোজগার-পাতিও হয়ে যাবে। তারপর তুমি সরে পড়বে।

হরিমোহনকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল।

মিনিট দুয়েক পরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল অবশ্য।

বাসব ভাল করে ব্যাপারটা আবার বোঝাতে আরম্ভ করল।

বেঞ্জামিন পাকুড় গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

চার্চের আরেক প্রান্তে যে বাংলোটায় পামেলা আছে, এই পাকুড় গাছটার অবস্থান হল তার পিছনে বর্তমানে অবশ্য বেঞ্জামিনও এখানেই আছে। ভাগ্যক্রমে এই চার্চে লোক সমাগম হয় না বললেই চলে। রক্ষক ফাদার দেব-সেবায় এত লীন হয়ে থাকেন যে এখনও পর্যন্ত বুঝতেই পারেন নি, পামেলার সঙ্গে আরো একজন এখানে বসবাস আরম্ভ করেছে।

বেঞ্জামিনের ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে। এইভাবে আর কতদিন চলবে, তার হিসাব সে মেলাতে পারছিল না। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। পামেলার দোসর হিসাবে তাকে নিশ্চিত ভাবে খোঁজা হচ্ছে। এদিকে রেস্তও ফুরিয়ে আসছে—অফিসের দরজাও অনন্তকাল খোলা থাকবে না।

তেতো মুখে বেঞ্জামিন সিগারেট ধরাল।

বেঞ্জ—

পামেলা কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে!

মুখ না ফিরিয়েই বেঞ্জামিন বলল, বল।

তুমি ক্রমেই আমার ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠছ, বুঝতে পারছি।

লোভে পড়ে কেন যে আমি বিশ্রী কাণ্ডটা করতে গেলাম। মাঝ থেকে তুমি নিরপরাধ হয়েও রাজ্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ।

আগে যদি ভাবতে একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদের অন্ত থাকবে না, তবে একটা কথা ছিল। এখন আক্ষেপ করে লাভ কি?

পামেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি কিছু ভেবেছ?

কি ব্যাপারে?

আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে—

ভারি গলায় বেঞ্জামিন বলল, তোমাকে যে সত্যি ভালবাসি, তা তা বোধ হয় আমি প্রমাণ করতে পেরেছি। নইলে কবে সরে পড়তাম। ও কথা যাক। এটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ, এই ভাবে আমাদের বাকি জীবন কাটতে পারে না। ভয়-ভাবনার হাত থেকে বাঁচাব একটা উপায় বার করতে হবে।

আমার মাথায় তো কিছু আসছে না। তুমি—

ইতিমধ্যে একটা উপায় আমি বার করেছি। তবে আরেকবার তোমাকে রিস্ক নিতে হবে।

পামেলা কোন কথা বলার অবসর পেল না, দুজনে পরিষ্কার শুনতে পেল, বাড়ির সামনের দিকে গাড়ি এসে থামল। ভীত ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনে। পুলিশ এল নাকি?

তুমি এখানেই থাকো। আমি দেখছি।

কথাটা শেষ করে সবেমাত্র বেঞ্জামিন পা বাড়িয়েছে, বাড়ির বাঁ ধার দিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখল। ও চিনতে না পারলেও, পামেলা আগন্তুককে বিলক্ষণ চিনেছে—ওদের কোম্পানির ম্যানেজার অরিন্দম মুখার্জি। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের চুরমার হয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎকে ঝাপসা চোখে শেষবারের মত দেখতে পেল। আর কোন আশা নেই।

অরিন্দমও কম অবাক হয় নি। বলল, অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল মিস দত্ত।

পামেলার গলা বুজে আসছিল। কোন রকমে বলল, আমি এখানে আছি, জানলেন কি ভাবে?

কর্তারা এসেছেন। ওঁরাই আপনাকে বলবেন।

ওঁরা ··মানে···

দুজনেই এসেছেন। আসুন—

ওদিকে—

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন রণবীব সেন আব বীরেশ্বর.বিশ্বাস। দুজনকেই কিছুটা অগোছাল মনে হচ্ছে। বণবীব বেনসন অ্যাণ্ড হেজেসে মৃদু টান দিয়ে বললেন, লুকিয়ে থাকাব পক্ষে জায়গাটা অবশ্য ভাল। তবু আমাব বিশ্বাস হচ্ছে না. পামেলাকে এখানে পাওয়া যাবে।

আমিও যে কথাটা পুবোপুরি বিশ্বাস কবেছি, তা নয়—, বিশ্বাস বললেন, তোমাকে তো আগেই বললাম, একজন আমাকে ফোনে খবরটা দিয়েছে।

পুলিশকে খববটা দেওয়া উচিত ছিল।

আগে আমরা যাচাই কবে নিই। মুখার্জিকে পিছন দিকে পাঠানো গেছে। থাকলে যাতে পালাতে না পাবে--এস, ভেতবে যাবাব এবাব ব্যবস্থা দেখা যাক।

বিশ্বাস দরজায় করাঘাত কবলেন।

বার কয়েক ধাক্কাধাক্কি করার পব দরজা খুলে গেল।

ওধারে দাঁড়িয়ে অরিন্দম।

আসুন। মিস দত্ত আব তাঁর বন্ধু— দুজনেই রয়েছেন।

সেন আর বিশ্বাস ভেতরে ঢুকলেন।

টেবিলের একপাশ চেপে ধরে মাথা নিচু কবে দাঁড়িয়ে আছে পামেলা। ঠোঁট কাঁপছে একটু একটু। সমস্ত শরীবের ওপর দিয়ে ঘামের স্রোত বয়ে চলেছে। এ রকম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত সাহস আর, ক'জনের হয়? ছায়াছন্ন মুখে, বুকে হাত বেঁধে আরেক

পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেঞ্জামিন। এখান থেকে সরে পড়বার সুযোগ সে সহজেই করে নিতে পারত, শুধু মাত্র পামেলার প্রতি গভীর আকর্ষণই তাকে এখানে অনড় করে রেখেছে।

পামেলার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে রণবীর বললেন, দেখা যাচ্ছে, তুমি সঠিক খবরই পেয়েছিলে। মিস দত্ত, আপনাকে আমরা কোন রকম ঝামেলায় ফেলতে চাইনি না, আপনি শুধু টাকাটা বার করে দেবেন।

কোন রকমে পামেলা বলল, টাকাটা আমার কাছে নেই।

ইনিই বোধ হয় আপনার বন্ধু—, বীরেশ্বর বললেন, আপনার কাছে না থাক, ওঁর কাছে আছে। মোট কথাটা হচ্ছে, টাকাটা এখনই আমাদের দিয়ে দিতে হবে। কত ভাল ডিলিংস একবার ভেবে দেখুন, পুলিশকে আমরা কোন কিছুই জানাচ্ছি না।

শান্ত গলায় বেঞ্জামিন বলল, টাকাটা আমাদের কাছে নেই। চুরি গেছে। বিশ্বাস আপনারা করবেন না জানি, তবে এটাই হল সত্যি কথা।

আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি—,পামেলার চোখে জল ঃ লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত টাকাটা কিন্তু আমি নিজের কাছে রাখতে পারি নি। বেঞ্জামিন যা বলল, চুরি হয়ে গেছে।

রণবীর বললেন, সহজেই সমস্ত কিছু মিটে যাবে, আমাদের ভেবে নেওয়া ঠিক হয় নি বিশ্বাস। এরা সোজা রাস্তার মানুষ নয়। আমাদের—

তুমি ঠিকই বলছ—, বীরেশ্বর বললেন, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। মিস দত্ত, আমাদের দেওয়া সুযোগ আপনারা নিলেন না। এবার কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বেন।

মিনতিতে ভেঙে পড়ল পামেলা ঃ মিথ্যে কথা আমরা বলছি না। বিশ্বাস করুন, সত্যি টাকাটা আমাদের কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে।

মুখার্জি, দেখুন কাছাকাছি ফোন আছে কিনা। লালবাজারে খবরটা পাঠান। ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুক।

অরিন্দম দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েছে সবে, হরিমোহনকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। তার চালচলনে যত্নকৃত বেপরোয়া ভাব। ঘরের সকলেই সচকিত হলেন। আগন্তুক কারোরই পরিচিত নয়।

বেঞ্জামিন প্রশ্ন করল, কি চান?

টাকা।

হরিমোহন ঘরের ভেতর দিকে মোটেই আসে নি। দরজার একটা পাল্লা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু টাকা পড়ে আছে কিছুদিন থেকে। আদায় করতে এলাম।

অরিন্দম বলল, আজেবাজে বকবেন না। কাকে কি বলতে এসেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

আমার নাম হরিমোহন। সোমেন গুহর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাল নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। পুরো টাকাটা আমায় মেটায় নি। এদিকে সে তো পটল তুলে বসল। আমারই হয়েছে যত ঝামেলা। বাঁয়ে আনতে ডায়নে কুলোয় না। আমি তো পাওনা টাকাটা ছেড়ে দিতে পারি না।

অরিন্দম বলল. কে ছেড়ে দিতে বলছে আপনাকে? গুহর আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে আদায় করুন। এখানে এসেছেন কেন?

যত উটকো ঝামেলা।—বীরেশ্বর বললেন, এখন মশাই আপনি এখান থেকে যান। আমরা একটু ব্যস্ত আছি।

একগাল হেসে হরিমোহন বলল, যাব বৈকি। সাধে কি আর এখানে এসেছি! পাওনাটা মিটে গেলেই চলে যাব।

কে মেটাচ্ছে আপনার পাওনা? রাবিশ—

আমি কি এমনি এখানে এসেছি। গুহ যার জন্য মালটা কিনেছিল, টাকাটা সেই মেটাবে। কি মশাই, টাকাটা দেবেন, না অন্য পথ ধরব?

রণবীর সেনের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ঝটিতে জ্বলন্ত বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ঠোঁট থেকে নামিয়ে বললেন, আপনি আমায় কিছু বলছেন কি ?

আপনাকেই তো। টাকাটা দিন। চলে যাই।

ননসেন্স! কি সমস্ত বলছেন ?

হরিমোহন বাঁকা হেসে বলল, ঠিকই বলছি। সেদিন গাড়িতে বসেছিলেন। ভাবছেন, আপনাকে চিনতে পারি নি। আমার কাছে কেনা রিভলবার দিয়ে গুহকে মারা হয়েছে, কথাটা পুলিশ জানতে পারলে···

সাট আপ! ইডিয়ট!

রণবীর ঝলসে উঠলেন।

পুলিশে যাবার সুযোগ তুমি আর পাবে না। আমাকে লেজে খেলাতে যাওয়ার ঝুঁকি যে অনেক বেশি, এখনই তার প্রমাণ তুমি—

পকেট থেকে অস্ত্রটা বার করবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার সেন।

চমকে রণবীর দরজার দিকে মুখ ফেরালেন।

হরিমোহন নির্বিকার। বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে যাওয়া ঘরের আর চারজন মানুষও দরজার দিকে মুখ ফেরালেন। দাঁতে পাইপ চেপে বাসব ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি।

মিস্টার সামন্ত, আপনার লোকজনকে এবার আগে বাড়ান। আরেকটা খুনোখুনি হবার আগেই ওঁর হাতে লোহার বালা পরিয়ে দেওয়া দরকার।

বীরেশ্বর এবার প্রায় চিৎকার করে বললেন, ব্যাপারটা কি ? দয়া করে আপনারা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন ?

মৃদু হেসে বাসব বলল, এখনও বুঝতে পারছেন না, সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে আপনার ওই বন্ধুটি! সোমেন গুহকে উনি খুন করেছেন। পঁয়ষট্টি হাজার টাকাটাও এখন ওঁরই হাতে।

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রণবীর বললেন, আপনার এই সমস্ত ছেঁদো কথায় কিছুই আসে যায় না। কোন প্রমাণ আছে হাতে? মনে রাখবেন, কলকাতার সেরা ব্যারিস্টার আদালতে আমার হয়ে লড়বে।

আদালতের ব্যাপারটা পুলিশ বুঝবে। ও নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। প্রমাণের কথা বলছিলেন? দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, কিছু এমন প্রমাণ হাতে আছে, যার পাশ কাটিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

ততক্ষণে পুলিশ অফিসাররা রণবীরের হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছে। পকেট হাতড়ে বার করে নিয়েছে একটা রিভলবার।

বাসব আবার বলল, লাইসেন্সহীন রিভলবারটা এতগুলো সাক্ষীর সামনে আপনার পকেট থেকে বেরোল—এ সম্পর্কে আপনি কি ডিফেন্স দেবেন। গুহর শরীরের মধ্যে থেকে একটা গুলি আমরা পেয়েছি। এই রিভলবার থেকে গুলিটা যে ছোড়া হয়েছিল, সহজেই তা প্রমাণ হবে। এরপর গোয়ানিজ হোটেলের কথায় আসুন। ওখানকার একুশ এবং বাইশ নম্বর ঘরে যে সমস্ত হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আপনার ছাপও যে আছে, তা প্রমাণ করা যাবে। আপনার মোটরের চাবি আমরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে পেয়েছি। এর কি সদুত্তর আপনি দেবেন? ডুপ্লিকেট চাবি যে গ্যারাজ থেকে তৈরি করিয়েছিলেন, তার ঠিকানা আমরা পেয়েছি। তারা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুলিশ আপনার ফ্ল্যাট সার্চ করলে পঁয়ষট্টি হাজার টাকাও খুঁজে পাবে। বলুন, আরো শুনতে চান?

রণবীর আর কিছু বললেন না। পাশে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়লেন কোন রকমে।

পামেলা, বেঞ্জামিন আর অরিন্দম হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বাসবের দিকে। হরিমোহন পুলিশের আগমনটা এখানে আশা করে নি ভারি কাহিল হয়ে পড়েছে মনে মনে। বীরেশ্বর নিজের বিহ্বল

ভাবটা এখনও ঠিক মত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বললেন কোন রকমে, টাকাটা সেন কিভাবে নেবে? টাকাটা তো—

মিস দত্ত চেক ভাঙিয়েছেন।—বাসব বলল, আসল কারসাজি ওখানেই। মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে আপনার বন্ধু প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, একথা আপনার জানা ছিল না। উনি মিস দত্তর মনের ভাব ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন, মহিলার টাকার লোভ দুর্বার। সুতরাং টোপ খাওয়ালেন। অবশ্য গুহর সঙ্গে পরামর্শ করেই। গুহকে উনি আগেই দলে টেনেছেন। কোম্পানিকে ডুবিয়ে একাই সমস্ত আত্মসাৎ করতে গেলে একজন সহকারী অবশ্যই দরকার। চেকটা মিস দত্তর হাতে চালান করে দিয়েই উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছেন, ওটা ছিল অভিনয়। টোপটা বৃথা যায় নি। মিস দত্ত সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। টাকাটা তুললেন এবং সরে পড়লেন। তিনি কি ভাবেই বা বুঝবেন, একজন তাঁর পিছনে ফেউয়ের মত লেগে আছে। বলা বাহুল্য সে আর কেউ নয়, সোমেন গুহ। পাকা খেলোয়াড়ের মত আপনার বন্ধু তখন এগোচ্ছেন। গুহকে টাকাটা হাতাবার জন্য পাঠালেন। এবং উনিও পৌঁছলেন পিছু পিছু। গুহর মত সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা আর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। ওকে শেষ করে দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করলেন। এবং সরে পড়লেন টাকাটা নিয়ে।

মিস দত্তর সন্ধান দিয়ে আপনি তাহলে আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন?

ঠিক তাই। হরিমোহনও এসেছে আমারই ইঙ্গিতে। পুলিশের সুবিধার জন্য সকলকে একত্রিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আর নয়। আপনি বরং কাল কোন সময় আমার বাড়িতে আসুন। বিশদ ভাবে কথা হবে। মিস্টার সামন্ত, এখন চলি।

বাসব মুখে হাসি টেনে দরজার দিকে ফিরল।

। দুই ।

ভারী নিশ্বাসে ষ্টাডি ভরপুর।

সুদেব তাকিয়ে আছে সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের দিকে। শুধু সুদেব নয়, ডাঃ দে, মিঃ সরকার এবং ইন্সপেক্টার সুকুমার দেবের দৃষ্টিও সেই দিকে নিবদ্ধ। রক্তাপ্লুত অবস্থায় টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন সৌমেন সিংহ।

কাল সন্ধ্যায় দেখা সজীব সতেজ লোকটা আজ আর পৃথিবীতে নেই! স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও কথা ছিল, তাঁকে কেউ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। সুকুমার দেব এগিয়ে গিয়ে তাঁর গায়ে হাত রাখলেন, পাথরের মত শক্ত। পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় তিনি বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

মৃত অবস্থায় সৌমেন সিংহ কতক্ষণ এখানে পড়ে থাকতেন কে জানে? এক রকম দৈবাৎ তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে তন্দ্রা। সৌমেন সিংহের একমাত্র মেয়ে। গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। হাসিখুসী, প্রিয়ংবদা—কলেজের পরিচিতারা তাকে মিষ্টি মেয়ে বলে ডাকে।

খুব ভোরে তন্দ্রার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। বিছানায় খানিক এপাশ ওপাশ করে সে উঠে পড়েছিল। খাট থেকে নেমে আঁচল দিয়ে মুখে মুছতে মুছতে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে দেখলে বাগানটাকে ভারী সুদৃশ্য মনে হয়। মর্নিংগ্লোরির ঝোপটা কিন্তু দেখা যায় না এই ধার থেকে। গত সন্ধ্যায় ওই ঝোপের ধারে বসে অনেকক্ষণ দীপঙ্করের সঙ্গে গল্প করেছিল তন্দ্রা।

জানলার কাছ থেকে তন্দ্রা সরে আসছিল, হঠাৎ তার দৃষ্টি গেল ষ্টাডির দিকে। সেকেলের বাড়ী। কাজেই দোতলার এই ধার থেকে একতলায় অবস্থিত ষ্টাডি পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে আলো জ্বলছে

তন্দ্রা অবাক না হয়ে পারেনি। ভেন্টিলেটারের ফোকর দিয়ে আলো আসছে। ব্যাপারটা কি? বাবা কি রাত ভোর ঘুমননি।

তন্দ্রা দ্রুত নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দাতেই দেখা হল বাড়ীর পুরানো চাকর শ্যামাচরণের সঙ্গে।

—তোমাদের কি আক্কেল বলতো? বাবা যে রাত ভোর বই পড়ে কাটিয়ে দিলেন সে হুঁস আছে?

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত গলায় বলল আমি বলেছিলুম। উনি বললেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ সেরে শুতে যাবেন।

তন্দ্রা নীচে নেমে এল।

ষ্টাডির দরজায় ধাক্কা দিল বারকতক।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। টেবিলে মাথা রেখে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তন্দ্রা এবার জোরে জোরে ডাকতে লাগল। শ্যামাচরণ ধাক্কা মারতে লাগল দরজায়। কোন সাড়া নেই। তাইত! কি হল? অসুস্থ হয়ে পড়েননিতো? দুজনে এবার ছুটে গেল বাগানে। পর পর দুটো জানলা। পাল্লা অবশ্য ভেতর দিক থেকে বন্ধ কাচের শার্শি থাকায় ঘরের ভেতরটা বাইরে থেকে দেখতে অসুবিধা নেই।

একি !!!

আর্তচীৎকার করে উঠল তন্দ্রা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শ্যামাচরণও দেখল, বসা অবস্থায় হুমাড় খেয়ে পড়ে রয়েছেন সৌমেনবাবু। হাতদুটো-ঝুলছে চেয়ারের হাতলের দু'পাশে পিঠের দিকে সাদা শার্ট চাপ চাপ রক্তে কালো হয়ে উঠেছে।

তারপর—

পুলিশ অবশ্য দরজা ভেঙ্গেই ভেতরে ঢুকেছে। ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টার দেব বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন। দুটো মাত্র জানলা আছে। দুটোই ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো। দরজা একটাই—যা ভেঙ্গে পুলিশ ভেতরে এসেছে। হত্যাকারী তবে ঘরে ঢুকলো কোন পথ দিয়ে?

দ্রুত হাতে প্রাথমিক কাজগুলো সারলেন ইন্সপেক্টার। তারপর চাকর বাকরদের জেরায় জেরায় জেরবার করে তুললেন। কিন্তু কোন মূল্যবান সূত্র পাওয়া গেল না তাদের কাছ থেকে। শ্যামাচরণের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই ডাঃ দে, মিঃ সরকার আর সুদেব চলে এসেছে এখানে। পুরাতন ভৃত্যর অজানা নয়, বাবুর পেয়ারের লোক এরাই।

মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর ডাঃ দে প্রশ্ন করলেন, কি রকম বুঝছেন ইন্সপেক্টার?

—খুবই গোলমেলে ব্যাপার। দেখি কত দূর কি করে ওঠা যায়। ওঁরা কথা বলতে বলতে পোর্টিকোতে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় একজন কনস্টেবল চাকর শ্রেণীর একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। তার বক্তব্য, এই লোকটা খিড়কির দরজা দিয়ে পালাচ্ছিল। তাই ধরে এনেছে।

সুকুমার বাবু প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি রত্নাকর। এ বাড়িতে কাজ করি।

—কাজ কর! কই, একটু আগে যখন সকলকে জেরা করলাম, তুমি তো তখন ছিলে না?

—আজ্ঞে, ঘুমচ্ছিলাম।

কুম্ভকর্ণের ভায়রাভাই। বাড়ীতে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল—এত হৈ-চৈ, তবু তোমার ঘুম ভাঙ্গল না? চোরের মত পালাচ্ছিলে কোথায়?

—পালাইনি। বাড়ীর বাইরে যাচ্ছিলাম।

ভারী গলায় ইন্সপেক্টার বললেন, আমার সঙ্গে দেখা না করে বাইরে যাচ্ছিলে কেন? জমাদার হাতকড়া লাগাও।

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রত্নাকর।

—আমায় ছেড়ে দিন হুজুর। আমি কিছু জানি না—আমায় ছেড়ে দিন।

ওর কথায় কান দিলেন না সুকুমার দেব রত্নাকরকে পুলিশ ভ্যানে

তোলা হল। ওর পেট থেকে প্রচুর কথা বার করা যাবে এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। কে বলতে পারে, ওই লোকটা খুন করেনি।

ষ্টাডির ভাঙ্গা দরজার সামনে একজন কনষ্টবল মোতায়ন করে তখনকার মত বিদায় নিলেন তিনি। তন্দ্রা নিজেকে সামলে নিলে পরে তার সঙ্গে এসে কথা বলবেন। চিন্তিত সুদেব একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। মনে পড়ে গেল গত সন্ধ্যার কথা। সবে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছে, টেলিফোন বেজে উঠল।

সুদেব রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো···কে···মিঃ সিংহ·· আমি বর্মন··

অপর প্রান্ত থেকে সৌমেন সিংহ বললেন, এখুনি চলে আসুন বিশেষ প্রয়োজন· ·

—এখনই আসছি·

—আমি অন্যান্যদের খবর দিয়েছি · ওঁরাও আসছেন·· ছেড়ে দিলাম···

তিনি লাইন কেটে দিলেন।

সৌমেন সিংহ।

সুবিখ্যাত টিম্বার মার্চেন্ট। লাউডন স্ট্রীটে নিজের বিরাট বাড়ীতে একমাত্র মেয়ে নিয়ে বাস করেন। প্রচুর অর্থ থাকার দরুন মনের আনাচে-কানাচে বহু হুজুগ বাসা বেঁধে রয়েছে। ওই সঙ্গে রয়েছে নানারকম বাতিক।

তাঁর মেয়ে তন্দ্রা। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। সুশ্রী ও সুগঠনা—প্রাণচঞ্চল মেয়ে। জন্মের ক্ষণেই মাকে হারিয়েছে সে। বাবার প্রাণঢালা ভালোবাসা পেয়েই বড় হয়েছে।

সুদেবের সঙ্গে সৌমেন সিংহের আলাপ বেশ কিছু দিনের। লায়ান্স ক্লাবে এই আলাপের সূত্রপাত হয়। সিংহ ওকে স্নেহের চোখে দেখলেও, সম্মান দিয়ে কথা বলেন। সুদেব এ রকম টেলিফোন আহ্বান বহুবার পেয়েছে। প্রতিবার তলবেই অত্যন্ত জরুরী বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে তা নিতান্তই মাছি মারতে কামান দাগার সামিল। অর্থাৎ কোন বার হয়ত তিনি ডেকেছেন মাছ ধরার প্রোগ্রামের বিষয় আলোচনা করতে। আবার কোনবার আসাম থেকে কমলালেবু গাছের চারা আনাবার বিস্তৃত জল্পনার জন্য। আবার কখন হয় তো—

একেই বলে বড়লোকের খেয়াল।

সাতটার কিছু আগেই সুদেব 'সিংহ-লজে' এসে পৌছাল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ও সোজা চলে গেল ড্রইং রুমে—যেখানে ডাঃ দে ও মিঃ সরকার রয়েছেন। গম্ভীর মুখে সৌমেন সিংহ পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর মুখের থমথমে ভাবে কোন কৃত্রিমতা নেই। মনে হচ্ছে এবার প্রকৃত কোন গুরুতর ব্যাপারের জন্যই আহ্বান করেছেন। সুদেবের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। একটু দেরী করে ফেলেছেন। বসুন।

সুদেব, ডাঃ দে ও মিঃ সরকারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটলেন মিঃ সিংহ। আরো খানিক পায়চারি করার পর, সোফায় এসে বসে বললেন, আমি হয়ত আর বেশীদিন বাঁচবো না। বয়স তো কম হোল না। বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম—

ডাঃ দে ওঁকে, বাধা দিয়ে বললেন, এ আপনার মনের দুর্বলতা মিঃ সিংহ। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি তো, স্বাস্থ্য আপনার ভালোই আছে।

—আছে হয়ত। কিন্তু আপসেট করতে কতক্ষণ। কয়েকদিন ধরে নানা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে চলেছি। যাক সে কথা। যে জন্য আপনাদের ডেকেছি এবার তাই বলি। আমি আমার উইল পাল্টাতে চাই।

মিঃ সরকার বললেন, পাল্টাতে চান! কিন্তু কয়েক মাস আগেই তো আপনি উইল করেছেন।—তা করেছি। আপনারাই সেই উইলের সাক্ষী ছিলেন। তবে এখন উইল পাল্টাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আপনারা জানেন, আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি আমার একমাত্র মেয়ে তন্দ্রার নামে লিখে দিয়েছি। তবু আবার উইল পাল্টাবার কেন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে, এ বিষয়ে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

ঘরের আর তিনটি প্রাণী নিরবে উৎকর্ণ রইল। মিঃ সিংহ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন. এই প্রসঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের কিছু আপনাদের বলতে হবে, বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর বিপুল সম্পত্তি আমার ও দাদার হাতে আসে। আগেকার মত আমরা এক সঙ্গেই বাস করতে শুরু করি। আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল ছিল। সময় কেটে যেতে লাগলো আনন্দে। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। প্লেনক্র্যাসে মারা গেলেন দাদা বৌদি। আমি চারিধারে অন্ধকার দেখলাম। কিন্তু আমার সমস্ত শোক ভুলতে হলো দাদার একমাত্র ছেলে রণেনের মুখ চেয়ে। রণেনের বয়স তখন আট

বছর, তন্দ্রার জন্ম হয়নি। আমার স্ত্রী রণেনের ভার নিলেন। কিন্তু ওকে মানুষ করার বিষয়ে আমরা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। পড়ার বইয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল না—তার উপর বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে একেবারে বখে গিয়েছিল। আমি রণেনকে ভাল পথে আনার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। শেষে চরম হ'লো, যেদিন ও আমার আলমারির তালা ভেঙ্গে দু' হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল।

থামলেন মিঃ সিংহ। নিভে যাওয়া সিগারেট আবার ধরালেন।

ঘরের আর তিন জন নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন। মনের মধ্যে নানা কথা ওঠা নামা করছে। সুদেবের মনে হ'ল, উনি এত সিরিয়াস বোধ হয় কখনও হননি।

উনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। রেডিয়োতে এনাউন্সমেণ্ট হোল। কিন্তু রণেনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর কত বছর কেটে গেল—আমি ধরে নিয়ে ছিলাম, ও মারা গেছে। তাই সমস্ত কিছু উইল করে দিয়েছিলাম তন্দ্রার নামে। কিন্তু দিন কয়েক আগে একটা চিঠি পাবার পর থেকে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। চিঠি খানা দিয়েছে আমার নিরুদ্দিষ্ট ভাইপো রণেন।

—বলেন কি? তাহলে সে মারা যায়নি? প্রশ্ন করলেন, মিঃ সরকার।

—না, এতদিন মাদ্রাজে ছিল। আপনারা চিঠিখানা দেখুন।

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করলেন মিঃ সিংহ। সকলে ঝুকে পড়ে দেখলেন। অল্প কয়েকটি মাত্র কথা তাতে লেখা।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু,

দীর্ঘদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন। অনেক অপরাধ করেছি। এখন আমি অনুতপ্ত। বাকী জীবন আপনার

সেবাতেই কাটাতে চাই। কালই মাদ্রাজ থেকে রওনা হচ্ছি। বহুদিন এখানেই ছিলাম। প্রণাম নেবেন। ইতি—

রনেন।

সুদেব বললো, উনি আসবার আগেই তাই উইলটা পাল্টাতে চাইছেন?

—হ্যাঁ। চিঠি পড়েই বুঝতে পারছি, ও যথেষ্ট অনুতপ্ত। তাছাড়া সম্পত্তির উপর অর্ধেক দাবী ওর আছে। আপনারা বয়সে অনেক ছোট হলেও, কোন বৈষয়িক কাজ আপনাদের সাহায্য বা পরামর্শ ছাড়া আমি করি না। আজ উইল পরিবর্তনের ব্যাপারেও আপনাদের সাহায্য আমি চাই।

ডাঃ দে বললেন, আপনি এখন সম্পত্তি আধা-আধি বখরা করতে চান বোধ হয়?

—হ্যাঁ। তন্দ্রা ও রণেনের মধ্যে সমান ভাগ।—কিন্তু আমি বলছিলাম—মিঃ সরকার বললেন, অবশ্য একজন আইনজ্ঞ হিসেবেই আমি বলছি, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই। আপনি বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করুন। তারপর যা হয় করবেন।

কিছু আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, রণেন ফিরে আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারটা মুলতুবি রাখা হবে।

সুদেব দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়ে। মাত্র গতকালের কথা—এখনও পায়চারীরত মিঃ সিংহের চেহারাটা চোখের ওপর ভাসছে। আর আজ তিনি নেই, নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

কে তাঁকে হত্যা করলো?

বেলা তখন একটা।

দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে একটা সোফায় গা এলিয়ে বাসব পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। মাত্র গতকাল

একটি তদন্তের সাফল্য-জনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বেনারস থেকে ফিরেছে সে।

বাহাত্বর একটা রেজেষ্ট্রী চিঠি নিয়ে এল। রিসিট সই করে দিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করতেই বাসব অবাক হলো। চিঠির সঙ্গে পাঁচখানা একশ টাকার নোট পিন দিয়ে গাঁথা। চিঠি খানা বিশেষ বড় নয়। লাইন পাঁচেকের মধ্যে নিজের বক্তব্য শেষ করেছেন পত্র লেখক।

বাসব পড়লো—

মান্যবরেষু,

আপনি আমায় চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনার পরিচয় জানি, বিখ্যাত ধনী সৌমেন সিংহ নিহত হয়েছেন রহস্যজনক ভাবে, কাগজে পড়েছেন নিশ্চয়। এই হত্যার তদন্ত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমাকে নিরাশ করবেন না আশা করি। কিছু টাকা পাঠালাম।

ইতি—

সিংহ পরিবারের জনৈক বন্ধু।

বাসব ভালোভাবে চিঠি খানা দেখলো। বিচিত্র ব্যাপার! গত-কাল ও কাগজে পড়েছে মিঃ সিংহের নিহত হওয়ার কথা। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে না চিনলেও, বহু বন্ধুর কাছে ও বহু ভাবেই তাঁর নাম শুনেছিল বাসব।

সোফা থেকে উঠে ও টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। পুলিশের অনেক উপরওয়ালার সঙ্গে ওর দহরম। এ সম্পর্কে কথা-বার্তা তাদের সঙ্গে আগে থেকে বলে নেওয়া ভালো। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের সুবিখ্যাত মিঃ সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করল বাসব।

অপর প্রান্ত থেকে মিঃ সামন্ত বললেন, রক্তের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি চনমনে হয়ে উঠেছেন শুনে খুশী হচ্ছি। আমাদের কাছ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা পাবেন।

—ধন্যবাদ।

ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখছে বাসব। ১২×১২-র বেশী হবে না। পেল গ্রীন কালারের ডিসটেম্পার করা দেওয়াল। বাগানের দিকে পর পর দু'খানা জানালা আছে।

সুকুমার দেবকে সঙ্গে নিয়েই বাসব মিঃ সিংহর ষ্টাডিতে ঢুকেছে। সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, খান তিনেক চেয়ার ও একটা আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। দেওয়ালে গোটা কয়েক ল্যাণ্ডস্কেপ রয়েছে। মিঃ সিংহের দামী ওয়েবার্ণ ফ্রেমে বাঁধান একটা পোর্ট্রেটও ঝুলছে।

বাসব সিলিঙের দিকে তাকালো। বাগানের দিকে তাকাল। বাগানের দিকে দেওয়ালে সারি সারি তিনটে ভেন্টিলেটার। হাল্কা নীল রঙের কাঁচযুক্ত ভেন্টিলেটারগুলো বিশেষ বড় নয়। নিয়ন লাইটে ঘব আলোকিত করা হয়। কোন পাখা নেই। এয়ার কুলিং ব্যবস্থা।

বাসব সুকুমার দেবের দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ সিংহ টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিলেন বললেন তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, মারা যাবার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি কি করছিলেন কিছু। অনুমান করা গেছে?

ইন্সপেক্টার বললেন, সে সময় তিনি চিঠি লিখছিলেন। কারণ টেবিলের উপরেই ছিল অর্ধ সমাপ্ত চিঠি, আর ডান হাতে কলম।

—হুঁ। এ ঘরের কাজ আমার শেষ হয়েছে। চলুন, বাগানে ঘুরে আসা যাক এবার।

দু'জনে বাগানে এলো।

বাড়ীর পিছন দিকের বাগানের অংশ বেশ কিছু জমি জুড়ে। চতুর্দিকেই সিজিন ফ্লাওয়ারের সমারোহ। ফুলের উপর গৃহকর্তার যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তা সহজেই বুঝতে পা. যায়।

—চলুন, ষ্টাডির ব্যাক পোর্শানে।

ইন্সপেক্টার ওকে যথাস্থানে নিয়ে এলেন।

বাসব ঝুঁকে সেখানকার মাটি পরীক্ষা করতে লাগল। মাটি যদিও দেখা যাচ্ছিল না। ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত চারিদিক! সুকুমার দেবও এধার ওধার দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, যদি কোন সূত্র চোখে পড়ে। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, ঘাসের উপর কি একটা চকচক করছে—একটা বোতাম। বড় সাইজের কুচকুচে কালো একটা বোতাম। বেশ পুরু। মনে হয় কোটের বোতাম!

ইন্সপেক্টার এগিয়ে এলেন বাসবের দিকে। তাঁর অপূর্ব আবিষ্কার দেখাবার জন্যই অবশ্য। বলা যায় না, এই বোতামটাই হয়তো পরে দেখা যাবে হত্যা রহস্যের চাবিকাঠি। বাসব তখন হাঁটু গেড়ে বসে কি একটা দেখছিল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে বললো, এখানকার ঘাস দেখেছেন। কেমন যেন অবিন্যস্ত।

—মনে হচ্ছে ভারী কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘসে গেছে। এদিকে দেখুন, আমি এই বোতামটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

বাসব বোতামটা সুকুমার দেবের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললো, কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আমি এটাকে এখন নিজের কাছেই রাখছি। পরে ফিরিয়ে দেব আপনাকে।

ইন্সপেক্টার সম্মত হলেন।

ওখানে আর কিছু করার ছিল না। দু'জনে পার্লারে এসে দাঁড়ালো।

বাসব বললো, এখন আমি বাড়ি ফিরতে চাই। সন্ধ্যার পর আবার এখানে এসে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে। ভাল কথা, পোষ্ট মর্টমের রিপোর্ট একবার দেখতে পেলে ভালো হয়।

অন্য একটি কেসে বাসবের সঙ্গে ছিলেন সুকুমার দেব। কাজেই তিনি ওর কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বললেন, রিপোর্টের নকল আপনাকে পাঠিয়ে দেব?

—তার চেয়ে নকল নিয়ে আসুন না সাড়ে আটটার পর আমার

ওখানে। ততক্ষণে আমি এখান থেকে ফিরে যেতে পারব। দু'জনের মধ্যে কেস নিয়ে আলাপ আলোচনা হওয়া ভাল নয় কি?

—বেশ তাই হবে।

আটটা বেজে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

তন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে সিংহ-লজে যাওয়া হয়নি বাসবের। ও ড্রইংরুমে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কি চিন্তা করছে। শৈবাল ঘরে প্রবেশ করলো।

বসতে বসতে বললো, তুমি যে ক্রমেই ঈদের চাঁদ হয়ে যাচ্ছো। দেখাই পাওয়া যায় না। সকালে দু'বার এসে ঘুরে গেছি।

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললো, আর বল কেন ডাক্তার, সিংহ মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছি।

—কোন্ সিংহ! সৌমেন সিংহ নাকি? পেপারে তাঁর খুন হওয়ার কথা পড়েছিলাম বটে। তারপর—

বাসব সমস্ত কিছু খুলে বলল। রেজিস্ট্রি চিঠি পাওয়া থেকে বাগানে বোতাম কুড়িয়ে পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। থানায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ষ্টেটমেণ্ট পড়ে ও ঘটনাটা মোটামুটি জেনেছিলাম।

সুকুমার দেব এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন। বাসব সাদরে অভ্যর্থনা জানাল ওঁকে। উনি বসার পর পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন। কলিং বেলে চাপ দিয়েছিল বাসব। বাহাদুর এসে দাঁড়াল।

—আমাদের কফির ব্যবস্থা কর বাহাদুর।

বাহাদুর মাথা নেড়ে চলে গেল। বাসব রিপোর্টটা খাম থেকে বার করে চোখের সামনে মেলে ধরল। কোমরের উপর একটা এবং ঠিক ভার্টিব্রে ঘেঁসে একটা গুলি বিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সার্জেনদের অভিমত, মিঃ সিংহ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে একটু ছটফট করবারও অবকাশ পাননি।

বাসব রিপোর্টটা সেণ্টার টপের উপর রাখলো।

ইন্সপেক্টর বললেন, কি রকম বুঝলেন?

—কাজ ভালই এগুচ্ছে। এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ডাক্তার তুমিও তো সমস্ত শুনলে। সম্ভব হলে উত্তর দাও। মিঃ সিংহ যে ঘরে হত হয়েছেন, তার দরজা মাত্র একটা, দু'টো জানলা। সেগুলো সমস্তই ছিল ভিতর দিক থেকে বন্ধ। আমি দরজা পরীক্ষা করে দেখছি, ইয়েল লক লাগান নয়—কাজেই হত্যাকারী ঘরের বাইরে এসে দরজা টেনে বন্ধ করে দেওয়ায় ভেতর থেকে লক হয়ে গিয়েছিল, এ সম্ভাবনাও নেই। এখন আমার প্রশ্ন হ'ল, হত্যাকারী কিভাবে ঘরে ঢুকে নিজের কাজ হাসিল করেছিল? নিশ্চয় সে হাওয়ায় মিশে ঘরে প্রবেশ করেনি?

সুকুমার দেব বললেন, প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল, কোন গুপ্ত দরজা আছে বোধ হয়। মিঃ সিংহ বাড়ি তৈরী করেছিলেন সম্প্রতি। 'নিউ লাইফ কনস্ট্রাকশন কোম্পানী'র তত্ত্বাবধানে ওই বাড়ি তৈরী হয়েছে খবর পেয়ে ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। শুনলাম বাড়িতে কোন গুপ্ত দরজা নেই।

—আপনি আলেয়ার পেছনে ছুটে গিয়াছিলেন সুকুমার বাবু। ডাক্তার, তুমি কোন হদিশ খুঁজে পেলে?

শৈবাল বলল, না ভাই, এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।

বাহাদুর কফি নিয়ে এল। ওই সঙ্গে নাট্ ও পোটাটো চিপস্ও আছে। সে তৎপরতার সঙ্গে পরিবেশন করল তিন জনকে।

বাসব কাপে চুমুক দিয়া বললো, পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে উণ্ডের চারপাশে চামড়া পুড়ে গেছে একথা লেখা নেই। কাজেই অনুমান করে নিতে বাধা নেই যে, গুলি দূর থেকে করা হয়েছিল। এখন বাড়ীর পোজিশানের কথা চিন্তা করুন। মিঃ সিংহ টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। পিঠে গুলি লাগার জন্যই এ রকমটা হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেওয়া যাক হত্যাকারী কোন রকমে ঘরে

প্রবেশ করেছিল। কিন্তু পিঠেই বা সে গুলি করতে গেল কেন? যে পিঠে গুলি করতে পারে তার পক্ষে বুকে গুলি করা নিশ্চয়ই খুব শক্ত ব্যাপার ছিল না। যে ক্ষেত্রে বুকে গুলি করলেই মৃত্যু দ্রুত আসবে।

বাসব থেমে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, ধাঁধা ওখানেই। আসলে হত্যাকারীর পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। অর্থাৎ সে আদপেই ঘরের মধ্যে ছিল না। সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে পিঠে গুলি করাই সুবিধাজনক।

শৈবাল বলল, ঘরের দরজা জানলা সমস্ত ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাইবে থেকে গুলি চালান কিভাবে সম্ভব?

—সম্পূর্ণ সম্ভব। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সুকুমার বাবু, ষ্টাডির ঠিক পিছনে, বাগানের ওই অংশে ঘাসের উপর খানিকটা ঘসা দাগ দেখেছিলাম।

ইন্সপেক্টার মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

–এবার আপনাদের দু'জনকে ভেন্টিলেটারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

উত্তেজিত গলায় সুকুমার দেব বললেন, আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ভেন্টিলেটারের কাচ সরিয়ে গুলি চালিয়েছিল?

–এক্‌জ্যাক্টলি। ঘাসের উপর যে দাগ দেখেছি, আমার দৃঢ় ধারণা, তা মই রাখার চাপেই সৃষ্টি হয়েছে। হত্যাকারী মই বেয়ে ভেন্টিলেটারের কাছে উঠে যায়। সেখানে থেকে মিঃ সিংহব পিঠটাই সে দেখতে পেয়েছিল। তাই পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।

শৈবাল বলল, নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে দুবার গুলি ছোড়া হোল কিন্তু কেউ শব্দ শুনতে পেল না। নিশ্চয় সায়লেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল?

—নিশ্চয়ই তাই। এখানে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। হত্যাকারী মই ঘাড়ে করে খুন করতে আসেনি। তাকে

মইটা সংগ্রহ করে নিতে হয় মিঃ সিংহ'র বাড়ি থেকেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে সিংহ পরিবারের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ যে মই ইত্যাদির মত সামান্য জিনিসও কোথায় আছে তা তার জানা। তাছাড়া সে একজন ভালো লক্ষ্যবিদ। কারণ এত উঁচু থেকে ভার্টিব্রেটে টার্গেট করা সহজ কথা নয়।

সুকুমার দেব বললেন, আমি অবাক হচ্ছি মিঃ ব্যানার্জী। দ্রুত আপনি রহস্যের গেঁরোগুলো খুলে চলেছেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, চোখ কান খুলে রাখলেই অনেক রহস্য জটিল হবার অবকাশ পায় না।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় বাসব ও শৈবাল সিংহ লজে গিয়ে পৌঁছাল। ইন্সপেক্টার এখনও আসেনি। তাঁর উপস্থিতি বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনও নেই। আগেই টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সুদেব, ডাঃ দে ও মিঃ সরকারও উপস্থিত হয়েছেন। ড্রইংরুমে কথা হচ্ছিল। বাসবের অনুরোধে তিনজন পর্যায়ক্রমে সেদিন সন্ধ্যার ঘটনা বিবৃত করলেন।

—তাহলে মিঃ সিংহ সেদিন উইল পালটান নি।

সুদেব বলল, হ্যাঁ। আর রমেন বাবুর চিঠির বক্তব্য অনুসারে তাঁর এসে পড়া উচিত ছিল।

ডাঃ দে বললেন, কেন সে এল না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

—হুঁ। এই বাড়ীতে কে কে থাকেন?

সরকার বললেন, তন্দ্রা বর্তমানে একাই আছে। অবশ্য চাকর দারোয়ানদের কথা আলাদা।

—আপনাদের আর আটকাব না। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে বাড়ির পুরোনো চাকর শ্যামাচরণকে যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে বিশেষ সুবিধা হয়। তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামাচরণ ঘরে এল মিনিট কয়েক পরে।

বেঁটেখাটো লোক, বয়স হয়েছে। মাথার পাকা চুল ও শরীরের ঝুলে পড়া চামড়া তার সাক্ষী। দেখলে বুঝতে পারা যায়, এককালে বেশ বলশালী ছিল। এই দুর্ঘটনায় বেশ মুহ্যমান হয়ে পড়েছে সে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, তুমিই শ্যামাচরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—আমি তোমার বাবুর খুনের তদন্ত করতে এসেছি, নিশ্চয়ই শুনে থাকবে?

শ্যামাচরণ ঘাড় নাড়লো।

—এই সম্পর্কে তোমাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করছো?

—ত্রিশ বছর হয়ে গেছে।

—খুব পুরানো লোক তুমি তাহলে। সৌমেন বাবুর ভাইপোর কথা তোমার মনে আছে?

—সে কথা কি ভুলতে পারি বাবু। ওরকম বিচ্ছু ছেলে আর হয় না। কয়েক হাজার টাকা নিয়ে সে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল।

—তারপর?

—খুব হইচই হল কয়েকদিন। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। ভাইপোকে মানুষ করবার চেষ্টা বাবু খুবই করেছিলেন, কিন্তু ভালো হওয়া কপালে না থাকলে যা হয় আর কি?

—সবই অদৃষ্টের ফের। বাসব বললো, পরে রণেনের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি, না?

—না। এতদিন পরে শুনলাম, সে নাকি ফিরে আসছে। বাবু কয়েকদিন আগেই আমায় বলেছিলেন, তিনি চিঠি পেয়েছেন।

-ভালো কথা, রত্নাকর মানে যাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সে কতদিন এ বাড়িতে কাজ করছিল?

—দিন দশেকের বেশী হবে না। দিদিমনি ওকে রেখেছিলেন।

—হুঁ। এখানে সে কোথায় থাকত? তোমার সঙ্গে নাকি?

—আমার সঙ্গে! শ্যামাচরণ নিজের বিস্ময় ভাব দমন করে বললো, বাগানে যে চাকরদের কোয়ার্টার আছে তাতেই সে থাকত।

—আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো?

—আসুন।

শ্যামাচরণের পিছু পিছু বাসব ও শৈবাল বাগানের শেষ প্রান্তের একসারি এসবেশটাস্ শেড দেওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই ঘরটা।

দরজা খোলাই ছিল। ওরা তিনজন ঘরে প্রবেশ করলো। শ্যামাচরণ আলোটা জ্বেলে দিল। পাঁচ পাওয়ারের আলো বোধ হয়। তারই হাল্কা আলোয় দেখা গেল ঘরখানা ছোট। একধারে একটা খাটিয়া পাতা। খাটিয়ার উপর মলিন বিছানা। টোল খাওয়া টিনের তোরঙ্গটা রয়েছে খাটিয়ার তলায়।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বিছানা উল্টে-পাল্টে দেখল। ছেড়া তোষকটার তলা থেকে পাওয়া গেল এক প্যাকেট উইলস্ সিগারেট আর দেশলাই। এবার তোরঙ্গটা খাটিয়ার তলা থেকে টেনে বার করল ডালা খোলাই ছিল। তোরঙ্গের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলি ধুতি আর সার্ট। একটা সোয়ান ফাউনটেন পেন্ আর টেলিফোন লেখা একটা ছোট্ট চিরকুট।

চিরকুটটা বাসব নিজের পকেটে রাখলো। তারপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ঘরের সামনে একটা টানা বারান্দা। পর পর ঘরগুলো বারান্দা লাগোয়া। বারান্দার শেষের দিকে বাসবের দৃষ্টি আটকে গেল। বেশ বড় একটা মই দাঁড় করানো রয়েছে সেখানে। ও সেদিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মইটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে বাসবের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হল। সেখানে বাঁশের কিছুটা চাকলা উঠে গিয়ে চোঁচ বেরিয়ে রয়েছে। চোঁচে জড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো সোঁয়া ওঠা সুতো। বাসব সযত্নে সুতোগুলো খুলে নিয়ে, কাগজের অভাবে এক টাকার নোটে মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

—শ্যামাচরণ, বাড়ীতে আরো মই আছে ?

—আজ্ঞে না। ওই একখানাই মই।

—এবার আমাদের তোমার দিদিমনির কাছে নিয়ে চল।

—আজ্ঞে আসুন।

কয়েক পা এগোবার পর বাসব বলল, ওই যে তিনজন ভদ্রলোক তোমাদের এখানে আসা যাওয়া করেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পার ?

শ্যামাচরণ একটু চুপ করে থেকে বললো আমি চাকর মানুষ, আমার বলা ঠিক নয়। ওঁরা বাবুর সঙ্গে সব সময় গুজগুজ ফুসফুস করতেন, আমার ভালো লাগতো না। বাবু ওঁদের খুব ভালবাসতেন।

আর কোন কথা হল না। তিনজনে ক্রমে তন্দ্রার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার পর্দা সরিয়ে দিল শ্যামাচরণ। ঘরে প্রবেশ করল বাসব ও শৈবাল। সুসজ্জিত ঘর। তন্দ্রা জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল মুহ্যমানের মত। ওদের দেখে সে এগিয়ে এল।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনার মনের শোচনীয় অবস্থা আমি অনুভব করছি মিস্ সিংহ, তবু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে এলাম।

ধরা গলায় তন্দ্রা বলল, আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। পুলিশের পক্ষ থেকে আপনার বিষয় আমাকে জানানো হয়েছে' সুদেববাবু বলছিলেন, আপনি আমার কাছেও আসবেন।

শৈবাল খুঁটিয়ে দেখছিল তন্দ্রাকে। অপূর্ব সুন্দরী না হলেও, মোটামুটি চেহারা ভালই। একহারা দেহের গঠন, গৌরাঙ্গী। একটানা কান্নাকাটি করার দরুন বোধ হয় চোখের কোণ ভিজে রয়েছে। তন্দ্রার অনুরোধে ওরা সোফায় বসল।

বাসব গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, রত্নাকরকে আপনি অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন ?

—হ্যাঁ। আমাকে এসে ধরে পড়লো তাই রেখেছিলাম।

—ঠিক কি পজিসনে সে আপনাকে আবেদন জানিয়েছিল, বলবেন একবার?

—বোধ হয় দিন দশেক আগে সন্ধ্যার পর আমি আর দীপঙ্কর বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছি। মোড়ের কাছটায়—

—এক মিনিট, বাসব বাধা দিল, যাঁর সঙ্গে বাড়ী ফিরছিলেন তিনি কে?

তন্দ্রার মুখ আবিরের মত লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু নিজেকে সে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, দীপঙ্কর · মানে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। আমরা বেড়িয়ে ফিরছিলাম, মোড়ের কাছটায় পৌছাতেই রত্নাকর আমাদের সামনে এসে করুণ-ভাবে চাকরি প্রার্থনা করলো। আমার কেমন দয়া হল। তাছাড়া ওর ভদ্রগোছের চেহারা দেখে ওকে আসবাব ঝাড়া-মোছার কাজে বহাল করলাম।

—হুঁ। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বাবা অত্যন্ত সাদামাটা লোক ছিলেন। তাঁকে যে কেউ এইভাবে খুন করতে পারে—কল্পনাও করা যায় না।

—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আপনার জেঠতুতো দাদা ফিরে আসছেন।

—বাবার মুখে শুনেছিলাম। তিনি নাকি অনুতপ্ত হয়ে চিঠি দিয়েছেন।

—আপনার বাবার ইচ্ছে ছিল, রণেনবাবু ফিরে এলে সম্পত্তি তিনি দু'ভাগে ভাগ করে দেবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি। আপনি তাঁর একমাত্র ওয়ারিশন, তাই না?

—আমি এভাবে তাঁর একমাত্র ওয়ারিশন হতে চাই না মিঃ ব্যানার্জী। তন্দ্রার গলা থেকে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল, আমি কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

সমবেদনার সুরে বাসব বলল, আপনি অস্থির হবেন না মিস্ সিংহ। ভাগ্যের পরিহাসকে এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুর্ঘটনার আগের সন্ধ্যেবেলাকার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে? আপনার সেদিনকার কর্মসূচীটা জানতে পারলে ভালো হয়।

—কলেজ থেকে ফিরে এসে আমি বাড়ীতেই ছিলাম। সাতটায় দীপঙ্কর এল। আমরা বাগানের মরনিং গ্লোরির কুঞ্জে বসে অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম। দশটার সময় বাবার সঙ্গে ডিনার শেষ করি। তারপর আধ ঘন্টাটাক নানা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।

—সে সময় মিঃ সিংহের সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল?

—খুবই হাল্কা ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল আমাদের। শুধু একবার তিনি বলেছিলেন, রণেনের চিঠি পড়েই বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে অনুতপ্ত। আমি তাকে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা করব।

—দীপঙ্কর বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কি সূত্রে?

—দীপঙ্করের বাবা স্বর্গীয় সুপ্রকাশ রক্ষিত আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই···

—ও। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। মিঃ রমেন, ডাঃ দে ও মিঃ সরকার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

— ভালই। বাবা ওঁদের স্নেহ করতেন।

—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওঁদের সম্বন্ধে আপনি বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন কিনা?

—বিশেষ কথা? একটু চিন্তা করে তন্দ্রা বলল, এইটুকু বলতে পারি, যে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে বাবা ওঁদের সাহায্য নিতেন, ওঁদের মতামতের উপর নির্ভর করতেন।

—ধন্যবাদ। আর আপনাকে বিরক্ত করব না। এখন আমরা চলি। পরে হয়তো আবার আপনার কাছে আসতে হবে।

বাসব তন্দ্রাকে কিছু বলবার অবকাশমাত্র না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে। তন্দ্রার ঘরের সামনের বারান্দা শেষ হয়েছে সিঁড়ির মুখে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাসব বললো, আরেক বার বাগানে যেতে হবে।

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, আবার বাগান কেন?

—আবার মইটা পরীক্ষা করা দরকার।

দুজনে আবার চাকরদের কোয়ার্টারে এল।

মইটা মাটিতে শুইয়ে বাসব ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হোল। একটা ধাপে খানিকটা খানিকটা মাটি আটকে রয়েছে। মাটিই তো! আধ শুকনো মাটি। বাসব সাবধানতার সঙ্গে মাটিটা ঝরিয়ে নিয়ে রুমালে মুড়ে পকেটস্থ করল।

— ও কি হে, যা পাচ্ছ পকেটে চালান দিচ্ছ দেখছি।

—কথায় আছে ডাক্তার, যাকে রাখ সেই থাকে। কে বলতে পারে, একদিন এই মাটির টুকরোই সমস্ত রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে প্রকৃত সত্যকে টেনে বার করবে না?

—তা বটে।

—চল, আজকের মত এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

বাড়ি ফিরেই বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শৈবাল আসেনি, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের মোড় থেকেই বিদায় নিয়েছে। রত্নাকরের তোরঙ্গ থেকে পাওয়া টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা বার করল বাসব। রিসিভার তুলে নিয়ে নাম্বার দেখে ডায়াল করল।

ও প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল, সেণ্ট্রাল কর্ণার থেকে কথা বলছি…

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখলো। ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ফোন নাম্বারটা কোথাকার তা জেনে নেবার জন্যই ও এইপথ অবলম্বন করেছিল। সেণ্ট্রাল কর্ণার—বোধ হয় কোন হোটেল বা বোডিং

হাউস হবে। টেলিফোন গাইড থেকে সেন্ট্রাল কর্ণারের সন্ধান পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। বাসবের অনুমানই ঠিক। মর্ট লেনের একটা বোর্ডিং হাউসই বটে।

বাসব বাহাদুরকে ডেকে এককাপ কফি আনতে বলল। বেশ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে কিন্তু এখন বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। কফির পেয়ালা শেষ করেই লেবরেটারীতে গিয়ে ঢুকতে হবে। ও কফির অপেক্ষায় কোচে গিয়ে বসল।

ঠিক এই সময় সুকুমার দেব ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে মিঃ ব্যানার্জী। রত্নাকরের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি রকম! বাসব বিস্মিত গলায় বলল, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না মানে। তাকে তো আপনারা অ্যারেষ্ট করেছিলেন। জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে নাকি?

—জেল ভেঙ্গে পালালে বরং ভাল ছিল। আমার কোন দায়িত্ব থাকত না।

—কি হয়েছে আমায় খুলে বলুন।

—সেদিন পোষ্টমর্টমে মৃতদেহ পাঠাবার পর অফিসে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডি. সি. আমায় ডেকে পাঠালেন। গেলাম তার কাছে। তিনি মার্ডার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিয়ে বললেন, মিঃ সিংহ আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর আশু মীমাংসা চাই। আপনি কি ভাবে এগুচ্ছেন। আমি নিজের কাজের প্রসিডিওরটা বললাম।

তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, তারচেয়ে এককাজ করুন, রত্নাকরকে ছেড়ে দিন। তারপর ওর ওপর ওয়াচ রাখুন। দেখুন, ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে। আমার মনে হয়, এতে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

রত্নাকরকে ছেড়ে দেওয়া হল। টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স ওর ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য দু'জন লোক নিযুক্ত করলাম। কিন্তু আজ বিকেলে রত্নাকর আমার লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে।

সুকুমার দেব থামতেই বাসব বলল, আমি আপনাকে ঠিক ফলো করতে পারলাম না। রত্নাকরকে তো ছেড়ে দেওয়া হল, তারপর সে কি করল?

—তাকে ছেড়ে দিতে সে পাবলিক ফোন থেকে ফোন করে। তারপর আশ্রয় নেয় বেলেঘাটার বস্তিতে। সেখানকার একটা ঘরে দু'দিন কাটিয়ে দেবার পর আজ বিকেলে শিয়ালদায় আসে। সর্বক্ষণ আমার লোক ওর পিছনে ছিল। কিন্তু শিয়ালদায় আর ওকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়নি। ভীড়ের মধ্যে এক সময় গা ঢাকা দেয়। এখন কল্পনা করুন আমার অবস্থা—ডি. সি.-কে কি উত্তর দেব।

—আচ্ছা, পাবলিক টেলিফোন থেকে কোথায় সে ফোন করেছিল, খোঁজ নিয়েছেন?

—সেও বিচিত্র ব্যাপার। ফোন করেছিল আমার স্ত্রীকে।

—কি রকম?

—আমার স্ত্রীকে সে ফোন করে বলেছিল, আপনার স্বামী এলে বলে দেবেন আমাকে তিনি যতটা বোকা মনে করেছেন, আমি ঠিক ততটা নই। আমি জানি, আমার পিছনে লোক ফেউ এর মত লেগে রয়েছে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, রত্নাকরের রসজ্ঞান আছে বলতে হবে। যাই হোক, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার দৃঢ় ধারণা ওকে আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব।

পরের দিন বেলা আটটার সময় শৈবাল এল বাসবের এখানে। বাসব তখন বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাকে দেখেই বলল, মর্ট লেন কোথায় জান?

—থার্টিন এরিয়ায়। খুব সরু গলি।

—চল, সেই সরু গলির শোভা দেখে আসি।

ওরা বেরিয়ে পড়ল।

মর্ট লেনের মুখেই সেন্ট্রাল কর্নার। আধুনিক প্যাটার্নের একটি বাড়ী। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে এনকোয়ারী লেখা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কাউন্টার ক্লার্ক তাকাতেই বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করল, সম্প্রতি নতুন কোন বোর্ডার এখানে এসেছে?

—সর্বদাই নতুনদের আনাগোনা এই বোর্ডিং হাউসে। আপনি কার কথা জানতে চান বলুন?

—ধরুন, এমন কেউ সম্প্রতি এখানে এসেছেন কি, যিনি ঘর ভাড়া নিয়েছেন অথচ থাকছেন না।

একটু চিন্তা করে ক্লার্ক বলল, রত্নাকর রায় নামে এক ভদ্রলোক ঘর ভাড়া নিয়ে দিন দু'য়েক বোধ হয় থেকে ঘর বন্ধ করে রেখে গেছেন বটে।

—তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন বলতে পারেন?

লেজার ঘেঁটে কাউন্টার ক্লার্ক বলল, উত্তরপাড়া থেকে। আগাম টাকা দিয়ে একমাসের জন্য ভাড়া নিয়েছেন।

—এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। ভাল কথা, আমি যে এনকোয়ারী করতে এসেছিলাম, একথা কোন বোর্ডারকে বলবেন না।

সেন্ট্রাল কর্নার থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে এল হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে। বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন।

বাসব তাঁকে দেখে বলল, আপনিই বোধ হয় দীপঙ্কর বাবু। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত।

দীপঙ্কর বললেন, মাত্র মিনিট পাঁচেক এসেছি। আপনার ফোন পেয়ে কাল রাত্রেই আসতাম। কিন্তু বিশেষ একটা কাজে জড়িয়ে পড়ায়—

—তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। আপনাকে কেন ডেকেছি

বুঝতেই পারছেন। মিঃ সিংহ সংশ্লিষ্ট গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।

—বেশ তো। আপনাকে আমি যে কোন ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত মিঃ ব্যানার্জী। শৈবাল ভাল করে দেখলো দীপঙ্কর রক্ষিতকে। লম্বায় ফুট ছয়েকের কাছাকাছি হবেন ভদ্রলোক। দোহারা চেহারা, মাজা মাজা গায়ের রঙ। চমৎকার শ্রী আছে মুখের। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যেই।

বাসব পাইপ ধরাল।

—সিগারেট খাই না, কাজেই অফার করতে পারলাম না।

—আমারও সিগারেটের নেশা নেই।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, সৌমেন সিংহের সঙ্গে ডাঃ দে, মিঃ সরকার ও মিঃ বর্মনের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

—এ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনেছি, প্রত্যেকটি বৈষয়িক ব্যাপারে উনি ওঁদের সাহায্য নিতেন।

—ওদের তিনজনের সঙ্গে মিঃ সিংহের কি ভাবে আলাপ হয়েছিল? বিশেষত বয়সের যখন এত পার্থক্য ছিল, তখন এই ঘনিষ্টতা একটু আশ্চর্যের নয় কি?

—আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন, মিঃ সিংহ বেশ খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন? এঁদের তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই মনে করি। আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল লায়ন্স ক্লাবে।

-আপনার কি মনে হয়, তিনজনই বেশ উচ্চমানের লোক?

—দেখুন, দু'জন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে একজনের বিষয় কিছু বলা যায়। আমি সুদেব বাবুর কথা বলছি। উনি যে বিশেষ এক অভিসন্ধি নিয়ে ও বাড়িতে যাওয়া আসা করেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—অভিসন্ধিটা কি বলতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?

দীপঙ্কর বললেন, মিঃ বর্মন তন্দ্রাকে বিয়ে করতে চান। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তিনি মিঃ সিংহকে কনভিন্স করবার চেষ্টা করছিলেন।

—কিন্তু আপনি যেন বললেন, তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে……

আপনি ঠিকই শুনেছেন, তন্দ্রার সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে রয়েছে।

বাসব পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বলল, রত্নাকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে শুনেছেন ?

--একথা শোনার পর আমি অবাক হয়ে গেছি। কারণ তাকে দেখে আমার ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিল।

—প্রথম দর্শনে যারা ভালো, অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ভাল থাকেন না। আচ্ছা, আপনি রণেন বাবুকে চিনতেন ?

—সিংহ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। স্কুলে আমি ও রণেন একই সঙ্গে পড়তাম। অত্যন্ত দুরন্ত ও উদ্ধত স্বভাবের ছিল সে।

—ধন্যবাদ দীপঙ্কর বাবু। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। এখনকার মত প্রশ্ন আমার শেষ হয়েছে।

দীপঙ্কর রক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তন্দ্রার মনের অবস্থা কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠেছে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এখন যদি হত্যাকারী ধরা পড়ে তাহলে অন্ততঃ সে কিছুটা শান্ত হবে।

—আমি সে চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

দীপঙ্কর রক্ষিত বিদায় নিলেন।

বাসব কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ধোয়ার জাল বুনতে লাগল।

শৈবাল বলল, আমার ওই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের ব্যাপার স্যাপার খুব ভালো বোধ হচ্ছে না।

—কেন ? এই মাত্র রক্ষিত তো ডাঃ দে ও ডাঃ সরকারের সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করলেন না।

—কিন্তু মিঃ বর্মন যে তন্দ্রা দেবীকে বিয়ে করতে চান তাকি ভুলে গেলে ?

জোরে হেসে উঠল বাসব।

—দেখ ডাক্তার, আয়েষা যেখানে আছে, জগৎ সিংহ ও ওসমান সেখানে থাকবেই। ও বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। এখন তোমাকে আমার দু'চারটে আবিষ্কারের কথা বলি।

শৈবাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—কাল সৌমেন সিংহের বাগান থেকে তিনটে জিনিস পেয়েছি। একটা বোতাম, সোঁয়া ওঠা কয়েকটা সুতো আর খানিকটা মাটি। আমি পরীক্ষা করেছি সেগুলো। বোতামটা ওভাব কোটের বলেই মনে হয়। সোঁয়া ওঠা সুতোগুলো পশ্মাস জাতীয়।

—আর মাটিটা ?

—মাটির ঢেলাটাকে তুমি সার্চ লাইট বলতে পার ডাক্তার। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে মাটির ঢেলার মধ্য থেকে আমি পেয়েছি সুরকি, বালির গুঁড়ো আর কয়লার ডাষ্ট। এখন শীতকাল চলেছে। দু'মাসের উপর হল বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায়নি। কাজেই কারুর জুতোর তলায় কাদা আটকে থাকবার কথা নয়। তোমাকে বলা হয়নি, ঐ কাদার টুকরোটা যে হত্যাকারীর জুতোর শোলে আটকে ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখন তোমাকেই প্রশ্ন করি, এই ড্রাই সিজিনে হত্যাকারীর জুতোর তলায় কাদার টুকরো কি ভাবে এসেছিল ?

শৈবাল একটু চিন্তা করে বলল, হত্যাকারী বোধ হয় কাদা জমি পার হয়ে হয়ে মিঃ সিংহর বাগানে ঢুকেছিল।

—ঠিক তাই। কিন্তু সিংহর বাড়ী অভিজাত পাড়ায়। আমরা তাঁর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও কাদার চিহ্নমাত্র দেখিনি। ধরে নিতে হবে, হত্যাকারীর বাড়ির কাছাকাছি এমন জায়গায় খানিকটা কাদা জমি আছে, যা তার পক্ষে মাড়িয়ে না আসা অসম্ভব।

—তোমার কথা মেনে নিলে একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, হত্যাকারী তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাদা মাড়িয়ে মিঃ সিংহর বাড়ি এল, অথচ শুকনো রাস্তায় পা দেবার পরও তার জুতো থেকে কাদা ঝরে গেল না।

—তুমি কি মনে কর, এই কথার উত্তর আমার কাছে নেই? আছে ডাক্তার। হত্যাকারী পায়ে হেঁটে নিশ্চয় মিঃ সিংহর বাড়িতে আসেনি। সে মোটর কার ব্যবহার করেছিল।

—শেষ পর্যন্ত তাহলে কি দাঁড়ালো? বোতাম, মাটির ঢেলা ও সোঁয়া ওঠা সুতোকে যোগ করে তুমি কি রকম ষ্ট্রাকচার খাড়া করছো শুনি?

বাসব বলল, প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সিতে চড়ে হত্যাকারী মিঃ সিংহর বাড়ির বাইরে এসে নামে। তারপর পাঁচিল টপকে বাগানে প্রবেশ করে সিঁড়িটা সংগ্রহ করে নেয়। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে হত্যাকারী সিংহ পরিবারের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। সে সিঁড়ি ষ্টাডির দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে, উঠে গিয়ে মিঃ সিংহকে গুলি করে। এই ঠাণ্ডায় সে নিশ্চয় কোট বা ওভার কোট পরে এসেছিল। কোট পরে মই বেয়ে ওপরে ওঠা অসুবিধাকর বিবেচনা করে সে কোট খুলে ফেলে। সেই সময় একটা বোতাম বোধ হয় খসে পড়েছিল। মই বেয়ে উপরে উঠবার সময় জুতোর শোল থেকে কাদা মইয়ের ধাপে আটকে যায়, আর পায়ের ঘসড়ানি লেগে চোঁচ বার করা অংশে সোয়েটারের উলের কিছু অংশ আটকে যায়। আমার থিওরি হল এই।

—রত্নাকর সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবে দেখেছো?

বাসব আর কিছু বলল না। পাইপে নতুন করে মিক্সচার ভরে, অগ্নি সংযোগ করে ঘন ঘন টান দিতে দিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে তন্দ্রা। ওর কিছু ভালো লাগছে

না। বাবার মৃত্যুর পর নিজেকে কোনমতেই আর সহজ করে নিতে পারছে না। খুব ছোট বেলায় মাতৃহীনা তন্দ্রা বাবাকেই দেখে এসেছে নিজের পাশেপাশে। সেই তিনি এই ভাবে চলে গেলেন!

শ্যামাচরণ ঘরে এল। তন্দ্রার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। শ্যামাচরণ বলল, সুদেববাবু এসেছেন। তাঁকে ড্রইং রুমে বসাতে বলে তন্দ্রা বিছানা থেকে ওঠে পড়লো। ও নিজের অবিন্যস্ত শাড়ী ঠিক করে নিয়ে ড্রইং রুমে এল।

সুদেব বলল, আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম মিস্ সিংহ। কিছু মনে করবেন না।

তন্দ্রা কোচে বসতে বসতে বলল, না, না, বিরক্ত আর কি! কিছু বলবেন আমায়?

—আজ রণেনবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। সেই বিষয়েই—

—রণেনদার চিঠি এসেছে!

—হ্যাঁ। তিনি আমায় লিখেছেন, বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে আসতে পারেননি। ওখানকাব সমস্ত কাজ মিটিয়ে দিন দশেকের মধ্যে আসছেন।

—কিন্তু! তন্দ্রা বলল, তিনি আপনাকে চিনলেন কি ভাবে?

—ভগবান জানেন। কোথা থেকে যে তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ করলেন তাও বলতে পারাছ না।

—চিঠিটা সঙ্গে এনেছেন? আমি দেখতে পারি?

—নিশ্চয়।

সুদেব নিজের পকেট থেকে একটা খাম বাব করে তন্দ্রার হাতে দিল। তন্দ্রা চিঠি খানা বার করল খামের মধ্যে থেকে।

মান্যবর সুদেববাবু,

আমার পরিচয় কাকার কাছে পেয়ে থাকবেন। কয়েকদিন আগে আমার কলকাতা যাবার কথা ছিল। কিন্তু আনবার্য কারণে তা সম্ভব হল না। এখানকার কাজ মিটিয়ে দিন দ'শেকের মধ্যে যাচ্ছি।

খবরের কাগজে কাকার মৃত্যু সংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হলাম। তন্দ্রাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই। খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো ও। হাজার হলেও আমি ওর বড় ভাই। কর্তব্যের খাতিরেই বলছি, তন্দ্রাকে দেখবেন। ওর সম্বন্ধে আপনার ওপর নিশ্চয় নির্ভর করা যায়। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

রণেন সিংহ।

তন্দ্রা চিঠি পড়ে ফিরিয়ে দিল। কারুর মুখে কিছুক্ষণ কথা নেই। শেষে সুদেবই নীরবতা ভঙ্গ করলো, আমি তাহলে উঠি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল তন্দ্রা। ওখান থেকে বেরিয়ে সুদেব নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল।

রিপন স্ট্রীটের এক বিরাট ম্যানসানের টু-রুম ফ্ল্যাটে ও থাকে। বলা বাহুল্য এখানে ধনীদেরই বসবাস। উপরে উঠে সুদেবকে অবাক হতে হল, কারণ তার ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে ডাঃ দে ও মিঃ সরকারকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁদের কাছে গিয়ে সুদেব বলল, কতক্ষণ এসেছেন?

ডাঃ দে বললেন, এইমাত্র।

দু'জনের মুখ বেশ গম্ভীর। সুদেব তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ওদের ভেতরে প্রবেশ করতে অনুরোধ করল। ঘরের মধ্যে এসে ডাঃ দে ও মিঃ সরকার বসলেন।

সুদেব বলল, আপনাদের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু বলতে এসেছেন যেন?

মিঃ সরকার বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক। আমরা দু'জন আজ সকালে মিঃ সিংহর এটর্ণি সত্যেন করগুপ্তর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম—

—ও, এই কথা। আপনারা ঠিক শুনেছেন। শেষ পর্যন্ত মত পালটেছিলেন মিঃ সিংহ। আমরা তিনজন সেদিন ওখান থেকে

আসার পর, তিনি আবার আমাকে ফোন করে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি, করগুপ্ত সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

ডাঃ দে বিদ্রূপ মাখান গলায় বললেন, আপনি বোধ হয় মিঃ সিংহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রণেন বাবুর নামে ট্রান্সফার করতে।

সুদেব বলল, আমি তাঁকে এরকম পরামর্শ দিতে যাব কেন? আমি কোন কথাই বলিনি। করগুপ্তর সাহায্যে তিনি তক্ষুনি খসড়া করলেন উইলের। সমস্ত সম্পত্তি দান করা হল রণেনবাবুকে। আমি ও এটর্ণি সাক্ষী হিসেবে সই করলাম।

মিঃ সরকার বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, এখন পাল্টাবেন না। তাছাড়া উইল পাল্টালে সম্পত্তি অর্ধেক দেওয়া হবে তন্দ্রা দেবীকে আব অর্ধেক দেওয়া হবে রণেনবাবুকে। অথচ—

—তিনি যে খেয়ালী লোক ছিলেন তা নিশ্চয় আপনারা অস্বীকার করবেন না। তাঁর কোন কাজে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

মিঃ সরকার আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দরজার সামনে বাসবকে দেখতে পেয়ে আর কিছু বললেন না। শৈবালও সঙ্গে রয়েছে। কেউই ওদের আগমন আশা করেন নি।

বাসব ঘরে প্রবেশ করে বলল, আপনাদেব বিশ্রাম ও আলাপে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত।

সুদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জী। আমরা কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্বছিলাম না। বসুন আপনি, শৈবালবাবু বসুন।

ওরা বসল।

—এবার বলুন, কি প্রয়োজনে এসেছেন?

—কিছুক্ষণ আগে পুলিশের সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, মিঃ সিংহ

শেষ পর্যন্ত নতুন উইল করেছিলেন এবং আপনি সেই উইলের অন্যতম সাক্ষী।

ডাঃ দে ও মিঃ সরকারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

—হ্যাঁ।

—এ সম্বন্ধে পুলিশকে বা আমাকে কিছু আপনি বলেননি ?

—আপনারা যে প্রশ্ন করেছিলেন আমি তার জবাব দিয়েছি। খুনের কেসে উপযাচক হয়ে কিছু বলা আমি বিবেচনার কাজ বলে মনে করি না।

—এখন নিশ্চয় বলতে আপত্তি নেই ?

ডাঃ দে ও মিঃ সরকারকে সুদেব যা বলেছিল সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলো সে।

বাসব বলল, শুধু তিনি আপনাকে কেন ডাকলেন দ্বিতীয়বার ?

—বলতে পারব না। এটাও তার একটা খেয়াল হতে পারে।

—হুঁ। আপনি ও মিঃ করগুপ্ত যখন বাড়ি থেকে চলে আসেন তখন রাত ক'টা হবে ?

—প্রায় দশটা।

—বাড়িতে ঢোকার সময় বা বেড়িয়ে আসবার সময় কাউকে দেখেছিলেন ?

—কাউকে ? সুদেব একটু ভেবে বলল, আমরা যখন ওখান থেকে বেড়িয়ে আসার মুখে পের্টিকোর কাছে এসেছি, তখন যেন একজনকে গেট পেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

—চিনতে পেরেছিলেন ?

—না জায়গাটা অন্ধকার ছিল।

—উঠি এবার। আরেক জায়গায় যেতে হবে। ভাল কথা, এখানে আসার পথে তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর মুখে শুনলাম, আপনি রণেনবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—চিঠিখানা একদিনের জন্য আমায় দেবেন ?

—কেন দেব না ?

সুদেব চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে বাসব-কে দিল।

—চলি তাহলে। এস ডাক্তার।

পুরো একটা দিন কেটে গেছে এরপর।

তন্দ্রার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এইমাত্র ফিরে এলেন দীপঙ্কর রক্ষিত। তাঁর মেজাজ বিশেষ ভাল নেই। তিনি শ্যামাচরণের মুখে শুনেছেন, সুদেব ও বাড়িতে ঘনঘন আসা যাওয়া শুরু করেছে। তন্দ্রাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট কয়েক বিশ্রাম করে দীপঙ্কর খাওয়ার ঘরে গেলেন। সংসারে তিনি একা মানুষ। চাকর দয়ারাম সবদিক সামলে চলে। নিজের বলতে একমাত্র পিসিমা আছেন। তিনি থাকেন বেনারসে। ওখান থেকে প্রায়ই চিঠি লিখছেন ভাইপোকে বিয়ের জন্য। এই ফাল্গুনেই তো বিয়েটা হয়ে যেত। মিঃ সিংহ মারা গিয়ে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল।

রাত্রের আহার শেষ করে তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। খাতাপত্র টেনে নিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে। বাড়ির সামনের অংশ ভাড়া দেবার জন্য যে ফ্লাট তৈরি করাচ্ছেন, তারই হিসাবের উপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ঘণ্টা দেড়েক কাজ করবার পর উঠে পড়লেন। এবার শুয়ে পড়লেই হয়। আলো নিভিয়ে নরম বিছানার মধ্যে আশ্রয় নিলেন দীপঙ্কর রক্ষিত।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বেড সাইড ল্যাম্পের আলোয় ঘরের অন্ধকার কিছুটা তরল হল। প্রথমে কিছুটা ঠাহর করতে পারেননি দীপঙ্কর। হাত দিয়ে চোখ রগড়ে এধার ওধার তাকাতেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো খাটের ঠিক সামনে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তির উপর।

অসংলগ্ন গলায় দীপঙ্কর বললেন, কে, কে ওখানে ?

গম্ভীর গলায় উত্তর এল, তোমার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে এলাম।

—কে তুমি ?

—চিনতে পারছো না ?

দীপঙ্কর বিছানা থেকে নামতে গেলেন, বাধা দিল আগন্তুক।

—যে ভাবে আছো, সেই ভাবেই থাক। বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বেলে আমার মুখ দেখার কোন স্বার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

—কি চাও তুমি ?

শীতের রাত্রেও দরদর করে ঘামতে লাগলেন দীপঙ্কর। আগন্তুক অনুচ্চ গলায় হেসে বলল, সাদা কথায় তোমার প্রাণটা নিতে পারলেই আমি খুশী হই।

—দীপঙ্কর বলল, আমার প্রাণ নেবে ?

—ঘুমন্ত অবস্থায় আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। তা যে করিনি দেখতেই পাচ্ছ।

—কিন্তু আমার অপরাধ কি ?

—অবুঝ হবার চেষ্টা করোনা। আমি কি বলতে চাইছি, তুমি যে না বুঝতে পারছো তা নয়। তোমাকে আর সুযোগ দেব না।

চাপা আলোকে আগন্তুকের ছোরা ঝলসে উঠল।

—না—না—না—

বাহাদুরের আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাসবের।

ও বিছানায় উঠে বসতেই বাহাদুর বলল, পুলিশ সাহেব এসেছেন।

—পুলিশ সাহেব! এত রাত্রে! বাসব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে গরম ড্রেসিং গাউন গায়ে গলিয়ে নিয়ে ড্রইংরুমে এল। সুকুমার দেব বসেছিলেন চিন্তিত মুখে।

ওকে দেখেই ইন্সপেক্টর বললেন, আবার এক ঝামেলা বেধেছে। দীপঙ্কর বাবুর শোবার ঘরে ঢুকে তাঁকে কেউ গুরুতরভাবে আহত করে গেছে।

—বলেন কি! কখন ঘটেছে ঘটনা?

—কখন ঘটেছে বলতে পারব না। তবে কিছুক্ষণ হল খবর পেয়েছি জোড়াবাগান থেকে। দীপঙ্করবাবুর বাড়ি ওই অঞ্চলে।

—পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরাল হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

—আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। আপনি যাবেন নাকি?

—নিশ্চয়। আমায় মিনিট পাঁচেক সময় দিন, কাপড় বদলে আসছি।

সুকুমার দেব ও বাসব যখন দীপঙ্কর বাবুর বাড়ি পৌঁছাল তখন ভোর হয়ে এসেছে! গৃহকর্তা মুমূর্ষুভাবে শুয়েছিলেন খাটে। বাঁ হাতে আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে ঘটনাটা বললেন দীপঙ্করববু। মৃত্যু তাঁকে প্রায় ছুঁয়ে গেছে। ছোরা আমূল বসে যেত তাঁর বুকে---ঠিক সেই সময় দয়ারাম দরজার গোড়ায় এসে পড়ায় আগন্তুক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

বাসব বলল, আপনি কি আন্দাজ করতে পেরেছেন, লোকটা কে?

—আমি তাকে চিনতে পারিনি। অথচ সে আমার সঙ্গে পরিচিত ভঙ্গীতে কথা বলেছে।

সুকুমার দেব বললেন, সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন, নইলে আপনাকে পোষ্টমর্টমের টেবিলে থাকতে হত এখন।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় দয়ারামকে জেরা করছিলেন জোড়াবাগান থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টার।

—মাঝরাতে তুমি দীপঙ্করবাবুর ঘরে গেলে কেন?

—আজ্ঞে বুড়ো হয়েছি। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। জেগে ছিলাম। হঠাৎ বাবুর ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম।

এত রাত্রে কে এসেছে দেখবার জন্য তাঁর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, একটা লোক বাবুকে চেপে ধরে ছোরা মারতে যাচ্ছে।

—তোমাকে দেখেই বোধ হয় সে পালাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর আমি ডাক্তার ও পুলিশকে ফোন করলাম।

বাসব দয়ারামের কথা মন দিয়ে শুনলো।

ওরা যখন দীপঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন বেলা আটটা। বাসব প্রস্তাব করলো চা-পর্বটা ওর এখানেই সেরে যেতে। ইন্সপেক্টরের আপত্তি নেই। হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিটে এলেন দু'জন। ড্রইংরুমে শৈবালকে খবর কাগজ পাঠরত অবস্থায় দেখা গেল। তাকে ঘটনাটি বলল বাসব। তারপর বাহাদুরকে ডেকে চা আনতে আদেশ করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চা এসে গেল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুকুমার দেব বললেন, ওই ঘটনার সঙ্গে মিঃ সিংহর হত্যাকাণ্ডের কোন সংযোগ আছে বলে মনে করেন?

—আপাতদৃষ্টিতে কোন রকম সংযোগ দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে আমার দৃঢ় ধারণা নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে। মিঃ সিংহ মারা গেছেন ১০ই জানুআরি, না?

—হ্যাঁ।

—আপনি ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো, ওই তারিখে রাত দশটার পর তারা কাউকে মিঃ সিংহের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছে কিনা।

—বেশ, খোঁজ নেব।

—যদি কোন ট্যাক্সিওয়ালা বলে, সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, তাহলে তার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করবেন, যাত্রীর দেহের বর্ণনা।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সুকুমার বিদায় নিলেন।

শৈবাল বলল, কি রকম বুঝছো?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, অনেক এগিয়েছি। আমার সাম্প্রতিক একটা আবিষ্কারের কথা তোমাকে বলি।

—তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সিংহ-পরিবারের জনৈক অজ্ঞাত-নামা বন্ধু আমাকে চিঠি লিখে কেসটা হাতেনিতে অনুরোধ করেছিল।

—মনে আছে বৈকি।

—সেই বন্ধুটি কে জান? সৌমেন সিংহের ভাইপো রণেনবাবু।

—সেকি! তিনি তো মাদ্রাজে।

—ওই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে।

—তুমি বলতে চাও, তিনি কলকাতায় ছিলেন?

হ্যাঁ এবং এখনও আছেন।

—বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু তুমি কিভাবে বুঝলে, রণেনবাবুই তোমাকে তদন্ত ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন?

—রণেনবাবুর লেখা চিঠিখানা সুদেববাবুর কাছ থেকে পেয়েই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। খামের কথা বাদ দাও। ওই চিঠির গায়ে কার কার হাতের ছাপ থাকা স্বাভাবিক? প্রথম, পত্র লেখকের, দ্বিতীয় যারা চিঠিটা হাতে নিয়েপড়েছে তাদের। কাজেই চিঠিটা থেকে তিনটে হাতের ছাপ পাওয়া গেল, রণেনবাবুর, তন্দ্রাদেবী ও সুদেববাবুর। এদিকে আমার কাছে অজ্ঞাত পরিচয়ে যে চিঠিখানা এসেছিল, তার থেকে একটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। বলা বাহুল্য এটা পত্রলেখকের। আমি মিলিয়ে দেখেছি, পত্রলেখকের হাতের ছাপের সঙ্গে রণেনবাবুর হাতের ছাপ মিলে গেছে।

—এযে ভীষণ কম্প্লিকেটেড ব্যাপার। তারপর?

—এরপর? এরপর আজ রাত্রে আমাদের ঘুমের দফারফা।

—অর্থাৎ?

—আজ রাত্রে আমাদের অভিসারে বেরুতে হবে ডাক্তার।

—অভিসারে! কোথায়?

—নিশ্চয় কোন উচ্ছ্বল যুবতীর নিভৃত আবাসে নয়। বারোটার পর আমাদের যাত্রা শুরু হবে। তোমার প্রস্তুতি প্রার্থনীয়।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, তথাস্তু।

শীতের রাতের কলকাতার একটা বিচিত্র রূপ আছে। তিমি মাছের পিঠের মত কালো অ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তাগুলো খাঁ খাঁ করছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ঘুমের কোলে এলিয়ে আছে মহানগরী। গ্রেট কোটের কলার যতদূর সম্ভব তুলে, ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাত ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে বাসব আর শৈবাল। এক সময় ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সামনেই একটা তেতালা বাড়ী। বাসব দরজায় করাঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে প্রবেশ করলে যে খুলে দিয়েছিল, সে দরজা বন্ধ করল।

—ফিরেছে?

—ঘন্টাখানেক হল ফিরেছে।

—আমাদের ঘরখানা দেখিয়ে দিন।

—আসুন।

লোকটা অগ্রসর হল। ওরা ওকে অনুসরণ করে দোতালায় এল। তৃতীয় ঘরখানায় করাঘাত করতেই সাড়া পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

—দরজাটা একটু খুলুন। আমি ম্যানেজার।

—এতরাত্রে বিরক্ত করছেন কেন?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। একবার দরজা খুলুন।

একটু অপেক্ষা করার পর দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসব ঘরে প্রবেশ করলো। শৈবালও।

দরজার পাশেই একজন দাঁড়িয়ে ছিল।

—একি! কে আপনারা?

বাসব হাল্কা গলায় বলল, বড় আলোটা জ্বালুন। আমাদের চিনতে আপনার কষ্ট হবে না।

কথাটা শেষ করে বাসব নিজেই এগিয়ে গেল। পকেট থেকে টর্চ বার করে সুইচ খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালল।

ভদ্রলোককে দেখে শৈবালের চেনা চেনা মনে হতে লাগল।

বাসব বলল, ভদ্রলোককে খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে তাই না ডাক্তার? এঁর ছবি ইন্সপেক্টার সুকুমার দেবের কাছে দেখেছো। ইনি রণেন সিংহ, ওরফে পলাতক রত্নাকর।

রণেন এবার কথা বলল, এতরাত্রে আপনারা হঠাৎ আমার ঘরে কেন এলেন বুঝতে পারছি না?

—দিনের বেলা যখন আপনার দর্শন পাওয়া গেল না, তখন এই সময়টা বেছে নিতে হল। আপনার ব্যাপার-স্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। এই তদন্ত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে অসহযোগিতা করছেন?

—আমি……মানে……আমতা আমতা করতে লাগল রণেন।

—শুনুন মিঃ সিংহ, আমার জানা নেই, কি পরিকল্পনায় আপনি এত কাণ্ড-কারখানা করেছেন। যাই-হোক, পুলিশের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তবে এখনও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

রণেন নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু গলায় বলল, বসুন আপনারা। আমি আন্তরিক ভাবে চাই কাকার হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

—বেশ। তাহলে আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আপনি ওদের বাড়িতে চাকর হয়ে প্রবেশ করেছিলেন কেন?

—আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন। অল্প বয়সে যে দুর্দান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছি, কাকা এখনও আমার ওপর বিরূপ মনোভাব নিয়ে আছেন কিনা জানবার জন্যই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলাম।

—তারপর?

—কয়েকদিন ওখানে থাকার পর এবং আগেকার ব্যবস্থা মত

আমার চিঠিটা ওঁর হাতে পড়ার পর, নানা রকম আলাপ আলোচনা আমার কানে আসায় বুঝতে পারলাম, কাকা আমার উপর বিরূপ নেই।

—তখন আপনার উচিৎ ছিল, কাকাকে নিজের পরিচয় দেওয়া।

—তাই তো দিলাম।

—অর্থাৎ ?

—সরাসরি কাকার কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। খুন হওয়ার আগের সন্ধ্যার কথা। মিঃ বর্মন ইত্যাদিরা বিদায় নিয়েছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়ালাম। কাকা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি চাই ? আমি তাকে প্রণাম করে বললাম, কাকা, আমায় চিনতে পারছেন না ? তিনি প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বললেন, কে, রণেন ! তুমি ! তুমি এইভাবে—। ছদ্মবেশে এ বাড়িতে আমার আসার কারণ বর্ণনা করবার পর বললাম, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আপনাকে ঠকাচ্ছি না। ছোটবেলায় আমার ডানহাতে যে গভীর ক্ষত হয়েছিল, তার চিহ্নও রয়েছে। তারপর অনেক সুখ দুঃখের কথা হল আমাদের দু'জনের। কাকা বললেন, এখন আর তোমার আসল পরিচয় কাউকে দেবার নেই। তুমি এখন যাও। আমি এটর্ণি করগুপ্ত-কে ডেকে পাঠাই। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

—সে সময় তন্দ্রা দেবী কোথায় ছিলেন ?

—বলতে পারবো না।

—এতদিন ধরে মাদ্রাজে আপনি কি করছিলেন ?

—নারকেলের ব্যবসা। এখনও আমার সেখানে ব্যবসা আছে।

—আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে।

—কি করতে হবে বলুন ?

—প্রথম, আপনাকে কাল সকালে নিজেদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে। তন্দ্রা দেবীকে ফোন করে আপনার সম্বন্ধে বলে রাখব। দ্বিতীয়,

আমি আপনাকে যা বলব তা অক্ষরে অক্ষরে শুনে যেতে হবে।

—বেশ।

ওরা যখন সেণ্ট্রাল কর্ণার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল তখন রাত আড়াইটা। বাসবের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। শৈবালের মনে হল চিন্তার সমুদ্রে ও ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর বাসব বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার মাথায় বোধহয় চিকিৎসা করানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডাক্তার।

—কেন?

—একটা সহজ বিষয় আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—বিষয়টা কি?

—আরো নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতে চাই না। চল, শেষ রাত্রিটা সার্থক করে তুলি।

—আবার কোথাও যাবে নাকি?

—হ্যাঁ। আরেক জায়গায় হানা দিতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় রণেনের আহ্বানে বাসব ও শৈবাল সৌমেন সিংহের বাড়িতে এল। ড্রইংরুমে ঢুকেই ওরা দেখল, সুদেব, ডাঃ দে, মিঃ সরকার ও দীপঙ্করবাবু উপস্থিত রয়েছেন, তন্দ্রা ও রণেন তো আছেই।

রণেন সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা প্রায় সকলেই আমাদের পারিবারিক বন্ধু। তাই আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। দীর্ঘ দিন পরে ফিরে এসেছি। আশাকরি, আপনারা সকলেই আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন।

ডাঃ দে বললেন, আপনি মিঃ সিংহর ভাইপো, আমাদের আন্তরিকতা পাবেন বৈকি।

মিঃ সরকার বললেন, ডাঃ দের সঙ্গে আমি একমত। তবে একটা অনুরোধ,আপনার উচিত মিঃ সিংহর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা।

—সে ব্যবস্থা করছি। বাসববাবু আমার অনুরোধেই একাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এখন আপনাদের আরেকটা কথা জানানো প্রয়োজন মনে করি। কাকা মারা যাবার আগে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী আমায় করে গেছেন। ওই সঙ্গে আমায় নিযুক্ত করে গেছেন তন্দ্রার অভিভাবক।

—তন্দ্রার অভিভাবক? দীপঙ্কর রক্ষিত প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। তন্দ্রা তাঁর সে আদেশ মেনে নিয়েছে।

বাসব এতক্ষণে কথা বলল, কিন্তু উপস্থিত আপনি সম্পত্তির অধিকারী বা তন্দ্রা দেবীর গার্জেন হতে পারেন না।

—কেন?

—হত্যাকাণ্ডের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

—এ রকম কোন আইন আছে কি?

—আইন থাকলেও আমার জানা নেই। তবে পুলিশ আপনাকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখছে, তাই—রণেন উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি কাকাকে খুন করেছি, এই কি পুলিশের ধারণা?

—পুলিশের ধারণার কথা পুলিশই আপনাকে বলতে পারবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মত হল, আপনার সামগ্রিক ব্যবহার অত্যন্ত সন্দেহজনক।

—আপনি ভুলে যাবেন না মিঃ ব্যানার্জী, এই কাজে আমিই আপনাকে নিযুক্ত করেছি।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এত দুর্বল স্মরণশক্তি আমার নয়। আপনি আমায় এ কাজে নিযুক্ত করেছেন বলে আপনার যে কোন সন্দেহজমক ব্যবহারকে বেমালুম চেপে যেতে হবে, নিশ্চয়ই এরকম কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

নিজের উত্তেজিত ভাবকে দমন করে রণেন বলল, এখন ও কথা থাক। পরে আলোচনা করবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

আমার মতে এই হল উপযুক্ত সময়। সকলে উপস্থিত রয়েছেন।

শুনুন মিঃ সিংহ, কথার জাল বুনে আমার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। কাল রাত্রে আপনি যে সমস্ত কথা আমায় বলেছেন তার উপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। কারণ আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি আপনি দীপঙ্করবাবুকে—

—বাসববাবু!

—হ্যাঁ, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি দীপঙ্করবাবুকে প্রাণে মারতে গিয়েছিলেন।

ঘরে চাঞ্চল্যের ঢেউ বয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললেন, সেকি! রণেন আমাকে ষ্ট্যাব করেছিল?

রণেন মুখ নিচু করে বসে রইল।

বাসব বলল, কাউকে আঘাত করতে যাওয়াও বিরাট ক্রাইম। আপনাকে আমি শেষ সুযোগ দিচ্ছি কাল সকালের মধ্যে যদি আপনি প্রকৃত তথ্য আমায় সরবরাহ না করেন তবে পুলিশকে সমস্ত কথা জানাতে বাধ্য হব। এস ডাক্তার। কথার অপেক্ষা না করে বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে শৈবাল বলল, চলে এলে যে?

—এইভাবে চলে আসব আগে থেকেই ঠিক করে গিয়েছিলাম।—কি যে হেঁয়ালী করে বলো কিছুই বুঝতে পারি না।

বাসব শুধু মৃদু হাসল।

প্রেত পুরীর মত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। চাপ চাপ অন্ধকার বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে। সশব্দে কোথায় রাত একটা বাজল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চলেছে কে? তাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা চলন্ত ছায়া। সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। তারপর শেষ প্রান্তের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল বারান্দার আলো। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তন্দ্রা। ছায়ামূর্তির দিকে দৃষ্টি পড়তেই আর্ত চীৎকার করে উঠল, কে, কে, ওখানে!

ওখান থেকে সরে আসবার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে ওর ছ' চোখে অন্ধকার নেমে এল। ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছায়ামূর্তি আর দাঁড়াল না। যে কাজ করতে এসেছিল তা না করেই দ্রুত নীচে নামতে লাগল। সিঁড়ির মুখ আগলে রয়েছে মূর্তিমান প্রতিবন্ধকের মত শ্যামাচরণ। এক লহমা। পরক্ষণে পকেট থেকে রিভলবার টেনে বার করল ছায়ামূর্তি। হিস্ করে একটা শব্দ হল—হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল শ্যামাচরণ।

ছায়ামূর্তি দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে গেল। এখন শুধু বাগানের পাঁচিলটা পার হতে পারলেই হল। কিন্তু দেওয়ালের—কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই নিস্তব্ধ রাতকে চুরমার করে আগ্নেয় অস্ত্র গর্জে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়ল ছায়ামূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে বাগান জেগে উঠল। ঘনঘন হুইশিলের শব্দ পাওয়া গেল। এখানে ওখানে টর্চ জ্বলে উঠল। টর্চ হাতে সুকুমার দেব দ্রুত এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ তিনি বাধা পেলেন।

—আর এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না ইন্সপেক্টার।

—কে, মিঃ ব্যানার্জী? গুলির শব্দ পেলাম—বাসব বলল, টর্চের আলো মাটির দিকে ফেলে দেখুন।

মাটির দিকে আলো ফেলতেই দেখলেন, উপুড় হয়ে কে পড়ে আছে।

—কে পড়ে রয়েছে?

—আপনার আসামী। মারা যায়নি, একটু আহত হয়েছে মাত্র। চিনতে পারছেন না—সৌমেন সিংহর হত্যাকারী দীপঙ্কর রক্ষিত।

কোচের উপর আড় হয়ে বসে বাসব পাইপ টানছিল। শৈবালের দিকে বার কয়েক আড় চোখে তাকিয়ে বলল, শেষটুকু শোনাবার জন্য বোধ হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছো ডাক্তার?

—স্বাভাবিক।

—তোমার ব্যস্ততা এক্ষুণি দূর করে দিচ্ছি। বাসব পাইপ নামিয়ে

আরম্ভ করল, প্রথমে সন্দেহের লিষ্ট থেকে সকলকেই বাদ দিতে হচ্ছিল। কারণ মিঃ সিংহ মারা গেলে দীপঙ্কর রক্ষিত, মিঃ বর্মন, মিঃ সরকার ও ডাঃ দে-র আর্থিক বা অন্য কোন ধরনের লাভ হচ্ছিল না। তন্দ্রা দেবী তাঁর বাবাকে খুন করেছেন—একথা ভাবতে মনে জোর পাচ্ছিলাম না। বাকী রইল রণেন সিংহ। চাকর হয়ে বাড়িতে ঢুকে কাকাকে নিজের পরিচয় দিয়ে যখন পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়লেন, তখন কাকাকে খুন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কারণ পরে আবার মিঃ সিংহ মত পাল্টাতে পারেন। মেরে ফেলতে পারলে আর কোন ঝামেলা থাকে না। সেদিন বোর্ডিং হাউসে রণেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় নামার পরই মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনা ঝলসে উঠল। ছেঁড়া কথা জোড়া লাগাতেই বুঝতে পারলাম হত্যাকারী কে? এক আগন্তুকের দীপঙ্কর বাবুকে ওই ধরনের কথাবার্তা বলে আহত করার কি উদ্দেশ্য। দুই, দীপঙ্কর বাবু ফ্ল্যাট বাড়ি করেছেন। কাজেই সুরকি, পাথরের গুঁড়ো তাঁর বাড়ীর কাছে ছড়ান। ইঁট ধুয়ে ধুয়ে কিছুটা অংশ কাদা হয়ে রয়েছে। সুতরাং ওই ধরনের কাদার ডেলা তার জুতোর তলা থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিন, সুকুমার বাবু অনুসন্ধান করে এক ট্যাক্সি চালকের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে খুনের দিন একজন ভদ্রলোককে রাত এগারটার সময় মিঃ সিংহর বাড়ির সামনে সে নামিয়ে দিয়েছে। সে যা প্যাসেঞ্জারের চেহারার বর্ণনা দিয়েছে—তখন আমার মনে হতে লাগল, দীপঙ্কর বাবুর সঙ্গে যেন ভীষণ মিল। আমি আর তুমি সেই রাত্রেই দীপঙ্কর বাবুর বাড়ি হানা দিলাম। সেখানে একটা ওভার কোটের সন্ধান পেয়ে যাই, যার একটা বোতাম ছিল না। আর যেগুলো ছিল তার সঙ্গে মিঃ সিংহর বাগানে কুড়িয়ে পাওয়া বোতামটার মিল হল।

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করল, পরের দিন দুপুরে রণেন বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পরিষ্কার ভাবে নিজের সন্দেহের কথা বললাম এবং এও জানালাম, তিনি যে কাণ্ড করেছেন, তার হাত

থেকে আমি তাকে বাঁচাব। শেষে তিনি যা বললেন তার সারাংশ হল, বাড়ি থেকে পালিয়ে রণেন বাবু সোজা মাদ্রাজ চলে যান। সেখানে এক ধনী তামিল ভদ্রলোকের আশ্রয়ে থেকে তার বিষয়-বুদ্ধি পাকে। এইভাবে বহু বছর কেটে যাবার পর কলকাতা ফেরার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠল। তিনি বাল্যবন্ধু দীপঙ্করকে চিঠি দিলেন। এদিকে তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে দীপঙ্করের বিয়ে স্থিব হয়ে গেছে। রণেন কলকাতায় এসে দীপঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে সিংহ বাড়িতেই চাকরী নেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত মাদ্রাজ থেকে তার লেখা চিঠি সৌমেন বাবুর কাছে আসে। এরপর কি ঘটেছে তুমি জান। সৌমেনবাবু খুন হলেন। যে কোন কাবণেই হোক, রণেনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, হত্যাকারী কে? তিনি পুলিশ হাত এড়িয়ে, এমনকি আমাকে নিযুক্ত কবেও, নিজের হাতেই দীপঙ্করকে শাস্তি দিতে গেলেন। এইখানেই তিনি মারাত্মকে ভুল কবেছিলেন। সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা হল তাঁব। হত্যাকারী কে জানা সত্বেও, তিনি নিজে জড়িয়ে পড়ায় ভয়ে নাম প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এদিকে প্রমাণের অভাবে আমি কিছু করতে পারছিলাম না।—আমার অবস্থা হয়েছিল, দূর থেকে নবম আলোয় হত্যাকারীকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ছুঁতে পাচ্ছি না। শেষে রণেনবাবুব সঙ্গে পরামর্শ কবে একটা প্ল্যান ঠিক করলাম। সেদিন সকলের সামনে আমাদের দু'জনে যা কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে, সমস্ত আগে কথা থেকে রিহার্সাল দেওয়া। আমি যখন বললাম, কাল সকালে যদি রণেনবাবু হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত কথা আমায় না বলে দেন তাহলে বিপদে পড়বেন।

দীপঙ্কর বাবু মনে প্রমাদ গুণলেন। রণেনবাবু সত্যি যদি সমস্ত তাঁর কথা বলে দেন, তাহলে? পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। রাত্রেই রণেনবাবুকে পথ থেকে সরাবেন। আমি ইন্সপেক্টারকে প্রস্তুত রেখে ছিলাম। দীপঙ্কর বাবু এলেন প্ল্যান মত। কিন্তু বাদ সাধলেন তন্দ্রা দেবী। বাথরুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার

আলো জ্বালতেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। চীৎকার করে উঠলেন। ধরা পড়ার ভয়ে উপায়ান্তর না দেখে তন্দ্রা দেবীকে আঘাত করে পালাতে গিয়ে দীপঙ্করবাবু শ্যামাচরণের মুখোমুখি হলেন। অগত্যা পথ পরিষ্কার করবার জন্য সায়লেন্সারযুক্ত রিভলভার ব্যবহার করলেন, আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম, হাতে-নাতে ধরব দীপঙ্কর বাবুকে কিন্তু সে সম্ভবনা সুদূর পরাহত দেখে এবং আসামী নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে লক্ষ্য করে, গুলি করে তাঁকে আহত করলাম।

—কিন্তু দীপঙ্কর বাবু সৌমেন সিংহকে হত্যা করলেন কেন ?

—এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারলে না। দীপঙ্কর বাবু তন্দ্রা দেবীকে বিয়ে করে সৌমেন সিংহর সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ব করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু রণেনবাবু মাদ্রাজ থেকে আসায় চিন্তিত হলেন। বোধ হয় মিঃ সরকার, ডাঃ দে ও মিঃ বর্মনের সঙ্গে মিঃ সিংহর আলোচনা তাঁর কানে গিয়েছিল। তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে গল্প শেষ করে ড্রইং রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কথাগুলো তাঁর কানে যাওয়া বিচিত্র নয়। এরপর, বুঝতেই পারছো, মিঃ সিংহ যাতে উইল বদলাতে না পারেন, সে ব্যবস্থা পাকা কববার জন্য চিব-দিনের মত তাঁকে বিদায় দিতে দীপঙ্কর রক্ষিতেব কোন অসুবিধা হয়নি।

শৈবাল বলল, দীপঙ্কর রক্ষিতের মত লোক পৃথিবীতে আরো কত আছে বলতে পার ?

—অনেক—অনেক আছে। আবার তাদের ধরিয়ে দেবাব মত লোকেরও তো অভাব নেই ডাক্তার। যেমন আমি—

বাসব আবার পাইপ মুখের কাছে তুলে নিল।

— —